শারদ সম্ভার

১৪৩১

বেঙ্গলি স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন অফ ভার্জিনিয়া টেক
নিবেদিত

PRESIDENT'S DESK

Durga Pujo has always been a celebration of community, a time when we come together under the gaze of the Goddess, sharing in joy, hope, and a profound sense of belonging. Here, in Blacksburg, we try, every year, to recreate a small piece of home, not just in rituals and customs, but in the warmth of our shared connection. This magazine is a testament to that spirit—the collective heartbeat of Bengali and non-Bengali students, alumni, and families who make this possible year after year.

As I write this, my heart swells with gratitude. Every smiling face, every helping hand, every word of encouragement has made this festival more than an event—it's a home away from home. Thank you to each of you who brought your time, your energy, and your love into this beautiful mosaic we can proudly call our Pujo.

But even as we celebrate, the weight of the year hangs in the air, impossible to ignore. The shadows of recent tragedies, especially the violence brought to light by incidents back home, remind us that our joy exists alongside deep sorrow. Back home, many women continue to live in fear, fighting battles they shouldn't have to fight. It is a harsh reminder that, though we celebrate the Goddess Durga's triumph over evil, the struggles of so many brave women in Bengal and across India are far from over.

How do we reconcile the joy we feel here with the pain that lingers there? Perhaps it's in recognizing that the same strength we honor in Maa Durga (Durga, the Mother) resides in these women too. It's in their resilience, in their courage to demand a better world. And in celebrating Pujo, we also celebrate them—their bravery, their defiance, and their spirit.

So, as we gather under the vibrant colors and familiar sounds of Pujo, let us hold space for both joy and reflection. Let us offer our prayers not just to the Goddess but to the real-life heroines who walk among us.

To all of you who have made this Pujo possible—thank you from the depths of my heart. You've given us a reason to smile, a space to connect, and a reminder of what community truly means. As we move forward, may this celebration continue to grow, and may our support for one another remain as unshakable as Maa Durga's own spirit.

With love and gratitude,

Nabayan Chaudhury
President, Bengali Students Association
Virginia Tech

সূচিপত্র

১
Durga Puja
Uddipto Chatterjee

৩
ভুলভাল
সোহম ব্যানার্জী

৬
বেঁচে থাকার গান গাই
দেবাশীষ সাহা

৭
Explore the nature on a bicycle
Omelee Day

৮
বোহেমিয়ানের ডায়েরি
অনীক সান্যাল

১২
Durga Puja - A celebration of harmony and faith
Raisa Rahman

১৪
C\O ফুটপাত
শ্রাবণী চৌধুরী

১৬
আর কবে তুই
রবীন্দ্রনাথ প্রধান

১৭
শরতের নানা রং
শ্রাবণী চৌধুরী

১৮
রাতকাহিনী
শ্রাবণী চৌধুরী

১৯
শেষগতি
শ্রাবণী চৌধুরী

২০
গল্প
কলিকাতার প্রাচীন উপকথা

২১
গোত্রহীন
কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী

২৩
ছবি
Kushal Chakraborty

২৫
শারদীয়াকে
চিরায়ত ভট্টাচার্য

২৮
রিক্সায় কোনো রিক্স নেই
Rohit

৩২
Biriyani
Soumik Ghosh

৪২
কে কে এসেছিল
সুপর্ণা বসু দে

৪৮
দুর্গাকথা
বর্ণালী চৌধুরী

৪৯
I am Alive
Sandeep Mukherjee

৫১
যদি এমনটা তো
শ্রেয়া লাহিড়ী

৫৫
তিব্বতি দাঁত
সন্দীপ মুখার্জী

৫৯
মা
চন্দ্রিমা মুখার্জী

Durga Puja

Durga Puja is the festival which brings smile to every Bengali. Everyone waits for a whole year to celebrate this magnificent festival of happiness. But you may wonder why it is the most deliberate puja of all? Well to know the answer to that let us hop into the vast old past of ours.

Many, many years ago an asura named “Mahishasura” used to live in the hell. Mahishasura is a Sanskrit word composed of “Mahisha” meaning buffalo and “Asura” meaning demon, together “Buffalo Demon” because he could change his appearance into a buffalo at his wish.

Mahishasur had penanced well to get boons form the god Brahma. The boon he received was that no man could possibly kill him. Just after gaining the boons he waged a war against the devas. Due to the boon he received from Brahma nobody among the devas led by Indra could kill or defeat him.

Subjected to defeat, the devas then approached Lord Vishnu and Lord Shiva who were aware that only a woman could kill Mahishasura. They decided to create a goddess out of their collective powers of all the devas and so a goddess was born who combined herself all that was mighty and powerful in each god.

Shiva gave her his trident, Vishnu gave her his Sudarshan Chakra and Brahma gave her his kamandalam of holy water and wisdom. Indra gave her his Vajra, Varuna gave her his conch, Agni gave her a missile spear, Vayu gave her a bow and arrows, Vishwakarma gave her his axe and an armour, and the lord of mountains gave her a lion as her vehicle.

Goddess Durga and Mahishasur had a very long and interesting fight. They fought and fought and fought with all their strengths. Mahishasur fought her and changed his forms countless times. First, he appeared as a buffalo. But goddess defeated him by wielding a sword. His next form was an elephant. He tied up the goddess’s lion, but Durga cut off his trunk. Mahishasura continued to terrorize her soldiers in his human and lion forms, but the goddess slew him with her chakra.

Goddess Durga's trident is the most recognizalbe symbols associated with Hindu mythology. The trident, with its three prongs, is interpreted to represent many trinities in Hindu mythology, including the three gunas, three time periods, and the three universal cycles. Underestimating goddess Durga's power she killed Mahishasura with that trident. Thereafter, she was named Mahishasuramardini, meaning the killer of Mahishasura. In the end Mahishasur surrendered against her so as a boon she told Mahishasura that "even if you were an asura later u will too be worshipped with me" so we worship Mahishasura along with goddess Durga. She is considered as "Shakti" or "Adishakti" because of her divine power which was embedded in her by all the devas and gods.

The "Shakti" or goddess Durga saved everyone from the dangerous asura who couldn't be killed by any male devas. That's why every people especially Bengalis await for this time of year to celebaret the winning of the good powers over evil.

Written by **Uddipto Chaterjee**
Art by **Arshia Bhattacharjee**

ভুলভাল

১

কাশফুলের কথা ভাবছিল সানায়া। পাঁচবছর হ'ল কাশফুল নজরে আসেনি। অথচ কাশফুল আদৌ তার প্রিয় নয়। তার ভাললাগে লিলি। সেই কাশ্মীরি শালওয়ালা লোকটা এসেছিল গতবছর, ফিরে যাওয়ার আগে একগোছা লিলি দিয়েছিল। এখনও মাঝেমধ্যে তার কাঁচাপাকা একরাশ চুলদাড়ির মাঝে নরম চোখদুটো মনে পড়লে কেমন একটা খেই হারিয়ে ফেলে সানায়া। ঠিক যেমন এই পুজোর সময়ে কাশফুলের কথা মনে পড়লে সব কেমন এলোমেলো হয়ে যায়। ধান্দার সময় এরকম হলে সমস্যা, জোর করে মাথাটাকে বাস্তবে এনে আচমকা হাত বাড়ায় সানায়া, "কই হিরো ? দেখি তোমার মেশিনটা..."

খদ্দেরভর্তি চা-সিগারেটের গুমটির সামনে দাঁড়িয়ে মাঝবয়সী কুন্দনলাল শা চমকে উঠে, ঝটপট দু'হাত নামিয়ে যৌনাঙ্গ আড়াল ক'রে ফেলে। খুকখুক হাসির রোল ওঠে খদ্দেরদের মধ্যে, আশেপাশের গুমটি থেকে।

— "টাইমের মেশিন গো হিরো" সশব্দে হেসে ওঠে সানায়া, কুন্দনের কব্জি ধরে চোখের সামনে এনে সময়টা দেখে নেয়। তিনটে বাজতে চলল। টেকো লোকটার আসার সময় হয়ে গেছে। আজকে টাকা আদায় ক'রেই ছাড়বে সানায়া।

জমাট ট্রাফিকে হিল্লোল তুলে সানায়া এগোতে লাগল । ভিক্টোরিয়ার গা ঘেঁষা কুইন্‌স ওয়ে রাস্তাটাই সানায়ার এলাকা । এই সূত্রে নিজেকে হিজড়ে কুইন ভেবে বেশ মজা পাওয়া যায় ।। লক্ষ্মীকান্তপুরের সনৎ নস্কর অবশ্য আদতে হিজড়ে নয় । নারীসুলভ ভঙ্গিমা, প্রথম হৃদয়ভঙ্গের বেদনা, সাড়া শরীরে অত্যাচারের দগদগে দলিল আর পকেটে একশো তিরিশ টাকা নিয়ে কলকাতা চলে এসেছিল আজ থেকে পাঁচবছর আগে । শিয়ালদা স্টেশনে যখন রেলপুলিশের কনস্টেবল তিনশো টাকার বিনিময়ে নিজের খিদে মেটানোর পর কে জানে কোন সুখে হাতের লাঠিটাও ঢুকিয়ে দিতে যাচ্ছিল, তখন শবনম মাসি এসে বাঁচায় । শিয়ালদার ব্রিজের পর থেকে ভবানিপুর পর্যন্ত কোন সিগনালে কে থাকবে, কোন পুলিশকে কত দেওয়া হবে, সবকিছুই মাসির হুকুম । মাসিই হাতে ধ'ররে শিখিয়েছে সবকিছু তালি বাজানো থেকে বাচ্ছা নাচানোর গান, গলার আওয়াজ পাল্টানো থেকে লাইনের খিস্তি । জন্মদিনে কিনে দিয়েছে মেকআপ কিট। সনৎ হয়েছে সানায়া, পরিশ্রম করেছে প্রচুর । এখন গোটা রাস্তার দায়িত্ব পেয়েছে দলে আসার পাঁচ বছরের মধ্যে । এমনিতে কেউ টাকা দিতে না চাইলে তাকে জোর করার নিয়ম নেই বহুদিন । কিন্তু এই টেকো লোকটা অদ্ভুত । টাকা চাইলে অন্যদের মত, "সামনে দেখ" বলে না, কপালে হাতও ছোঁয়ায় না । পাথরের মত মুখ করে তাকিয়ে থাকে । সাথের মহিলাও কেমন নির্বিকার হয়ে তাকিয়ে থাকে সামনের দিকে । সানায়ার ইগোতে লেগে গেছে, পাঁচ মিনিটের মধ্যে যে কেরালার ভিনভাষী গাট্টাগোট্টা লোকের থেকে টাকা আদায় করে, গাল টিপে, তার গোটা পরিবারের সামনে ফোন-নম্বরও আদায় করে নিতে পারে, সে একটা বাঙালি মিনমিনে টেকো বুড়োর রোয়াব মেনে নেবে কেন ?

টেকোর রুটিন জানে সানায়া, প্রতি শনিবার বেলা তিনটের সময় মহিলার পাশাপাশি কুইন্‌স ওয়ের এমাথা থেকে ওমাথা হেঁটে যাবে । তারপর আবার ফিরবে । হাত ধরবে না, কথা বলবে না, শুধু হেঁটে যাবে । পরকীয়া কেস বোধহয় ।

২

একসাথে কাশফুল দেখার কথা ভেবেছিলেন । দু'জনেই অবশ্য জানতেন ব্যাপারটা অসম্ভব । কলকাতার ত্রিসীমানায় কাশফুল নেই, আর একসাথে বাইরে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না । এর মাঝেই চোখের সামনে অনিমার শরীরটা খারাপ হ'তে দেখেছেন সমরবাবু । কিন্তু কিছুই করার ক্ষমতা ছিল না, প্রয়োজনে একটা ফোন করে খবরও নিতে পারেননি । হাজার হোক সম্পর্কটা অবৈধ । কেউই কি কিছুই টের পায়নি, মাঝেমধ্যে ভাবেন সমরভাবু । অবশ্য ভেবেই বা কী লাভ, কেউ তো সমরবাবুর কথা ভাবেনি যখন প্রতিনিয়ত স্ত্রী তন্দ্রার বাইপোলার টেন্ডেসির সাথে উথালপাথাল হয়েছে গোটা জীবন । অফিস থেকে বাড়ি ফেরাটা একটা বিভীষিকা ছিল, কিন্তু মান্তুর কথা ভেবে জলদি ফিরতেই হ'ত । তন্দ্রা ছোটখাট ঘটনাতেও প্রচুর পেটাত মেয়েটাকে, সমরবাবু না থাকলে বাড়াবাড়িও হ'ত অনেক সময় । ফলে যা হওয়ার ছিল তাই হয়েছে, মান্তু চাকরি পেয়েই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে । ভাড়ায় থাকছে, কলকাতাতেই । সমরবাবু বাধা দেননি । একটু নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচুক মেয়েটা । সমরবাবুও যেমন নিঃশ্বাস নিতে কুইনস ওয়েতে আসেন ।

একই অফিস । আলাদা আলাদা বেরিয়ে পার্কস্ট্রিট থেকে ভিক্টোরিয়ার দিকে চলে আসতেন দু'জনে । হেঁটে যেতেন এমাথা থেকে ওমাথা । অনিমারই বুদ্ধি, অফিসের কেউ শনিবারে এদিকে থাকবে না । শুধু বাচ্ছা ছেলেমেয়েদের ভিড় । তবে সমরবাবুর একটা বিষয়ে খুবই সমস্যা ছিল, হিজড়ে ।

সেই কোন ছোটবেলায়, সদ্যজাত মামাতো ভাইকে দেখতে গিয়েছিলেন সমরবাবু । হিজড়েরা ভাইটাকে বনবন ক'রে ঘোরাচ্ছে দেখে বছর দশেকের সমর বাগচি খানিকটা ভায়োলেন্ট প্রতিবাদ করেছিলেন । সেই দেখে দলের একজন

আচমকাই তাকে টেনে নিয়ে একটা চুমু খেয়েছিল । মুখ মুছতে মুছতে দৌড়ে সবার নজরের আড়ালে চ'লে গিয়েছিলেন সমরবাবু । সবাই হাসাহাসি ক'রেছিল, তবে মনে আছে বড়মামা কেবল খুব রেগে গিয়েছিলেন, বকাবকি করেছিলেন দলের সবাইকেই । কিন্তু সেই যে ভয় ঢুকেছিল মনে, সেটা আর সারেনি ।

এই রাস্তায় হিজড়েরা থাকে, পথ আটকে পয়সা চায়, না দিতে চাইলে গায়ে ঢলে পড়ে । অনিমার অবশ্য খুব মায়াদয়া ছিল, বলতেন, "খুব কষ্টের জীবন ওদের..." কিন্তু সমরবাবুর ভয়টুকুকে কোনদিন অসম্মান করেননি তিনি । এই রাস্তায় প্রায়ই একজন হিজড়ে পথ আটকে দাঁড়াত । সমরবাবু তারদিকে না তাকিয়ে সোজা হেঁটে যেতেন, অনিমাও তাই করতেন পাশাপাশি । ফেরার আগে শান্তিনিকেতনি চামড়ার পার্স থেকে দশটাকা বের ক'রে সমরবাবুর হাতে গুঁজে দিতেন । কথা ছিল, একদিন ভয় কেটে গেলে হিজড়েটিকে নিজের হাতে টাকাটুকু দেবেন সমরবাবু । ওই সময়টুকুই হাতে হাতে ছোঁয়া লাগত অনিমার সাথে ।

পরকীয়ামাত্রই প্রবল শারীরিক একটা সম্পর্ক, এরকম একটা ভাবনা সামাজিকভাবে কাজ করে বোধহয় । কিন্তু সমরবাবু এবং অনিমা কখনও ঘনিষ্ঠ হননি । একবার শুধু ভিড় মেট্রোতে কিছু ধরার না পেয়ে কনুইয়ের কাছটা আঁকড়ে রেখেছিলেন অনিমা । ভিড়ের চাপে বুকের সাথে বুক মিশে গিয়েছিল কিছুক্ষণের জন্য । মান্তুর জন্মের পর থেকে উপোষী থাকা সমরবাবুর শরীর কিন্তু জাগেনি তখনও । বরং মাথার গভীরে ফিরে এসেছিল ছোটবেলা মামাবাড়ির পুকুরে ডুব দেওয়ার স্মৃতি । চারপাশে ঘোলাটে সবুজ জল, বুকের কাছে নিজের হৃদস্পন্দন ছাড়া কোন শব্দ নেই । চোখ বন্ধ করে ফেলেছিলেন সমরবাবু, খানিকবাদে তাকিয়ে দেখেছিলেন অনিমার চোখও বন্ধ ।

সমরবাবুর চোখ এখন ঝাপসা । আজ অক্টোবরের প্রথম শনিবার, কুইনস ওয়েতে একা হাঁটছেন সমরবাবু । অনিমা আর নেই । হঠাৎই জানা গিয়েছিল প্যাংক্রিয়াটিক ক্যানসার । শেষের দিক । একটা ফোনও করতে পারেননি সমরবাবু ।

আচমকা পাশ থেকে হাত ধরে টানল কেউ, "কই গো অমিতাভ, আজ তোমার রেখা কই ?"

৩

হাতের মুঠোয় একগোছা দশটাকার নোট মুঠো করে ধরে দাঁড়িয়ে আছে সানায়া । প্রবল বৃষ্টি নেমে গেছে ততক্ষণে । গলার কাছে পাথর জ'মে গিয়েছে কেমন । টেকোর হাতে ছাতা নেই, এগোতে এগোতে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে লোকটা । সানায়া অনেকদিন বাদে সনৎ নস্করের কন্ঠস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, "কাকু দাঁড়ান!"

সমরবাবু পেছনে তাকালেন । কুন্দনলালের কাছ থেকে ছাতা নিয়ে দৌড়ে এসেছে সানায়া । সমরবাবু হাঁটছেন কুইনস ওয়ে ধ'রে, মাথায় ছাতা ধরে , কীসব বলতে বলতে সাথে সাথে এগোচ্ছে সানায়া । কনুইয়ের কাছটা ধরে আছে ।

অবিরাম ঝরতে থাকা ঘন কালো মেঘের সামনে বৃষ্টিভেজা ধবধবে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল আরও ফুটে উঠেছে, কংক্রিটের জঙ্গলে একগোছা কাশফুলের শুভ্রতা নিয়ে...

Written by **Soham Banerjee**
Photo by **Sayak Nag**

বেঁচে থাকার গান গাই

প্রখর দাবদাহের শেষে বর্ষার গান গাই;
ভাঁটার টানে না হারিয়ে উজানের গান গাই;
হিমশীতল রাত্রি যখন আঁধার নিয়ে আসে –
ভোরের প্রতীক্ষাতে মিঠে রোদের গান গাই।

একঘেয়েমির রোজনামচায় হঠাৎ ছুটি যেমন,
বছর শেষে নতুন বইয়ের গন্ধখানা যেমন,
দিনের শেষে ঘরে ফেরার তাগিদ যেমন ডাকে –
বিষাদ ভুলে তেমন ক্ষণিক খুশির গান গাই।

স্বপ্ন দেখার সাহস বুকে বাস্তবে যে লড়ে,
পেট চালানোর দায়ে যারা বিকোয় নি কখনো;
জীবন যখন তাসের দানে বিফলতা ছোঁড়ে –
টেক্কা হয়ে ফিরে আসা জেদের গান গাই।

ভবিষ্যতকে প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করে যখন -
বর্তমানের আয়না দেখায় জীবন প্রতি ক্ষণে;
হার মানবার কারণটা তো থাকে হাজার-রকম -
মুক্ত কণ্ঠ নিয়ে লড়ে যাবার গান গাই।

মুক্ত কণ্ঠ হয়ে বেঁচে থাকার গান গাই।।

Written by **Debasis Saha**
Art by **Priyanjana Nath**

Explore the nature on a bicycle

It was the first day of monsoon when I woke up early in the morning. I went to the backyard of house and saw my garden was looking fresh drenched in the first rain of the season. When I opened the window, cold breeze entered through it and patted on my shoulder telling me to move back. Turning back, I saw my bi-cycle was waiting for me in one corner of backyard of my house. It was pleading, “Let’s go for a ride today to explore unknown beauty of known places”. The fragrance of rain-soaked nature was so enchanting that I also couldn’t resist myself to go for a ride. That day I didn’t know the exact destination to reach, I was just following the aroma as if I was searching for its source. On the way I found some red and yellow flowers were lying on street. The petals were so pretty that I couldn’t run over them rather collected them in the basket of my cycle. I smelt them to know whether these flowers were the source of that magnificent fragrance. But alas! They weren’t. Then I started my journey again on bi-cycle. Suddenly the fragrance started to get stronger and stronger when I came closer to a cave. I entered inside the cave and found it was decorated with beautiful plants and flowers.

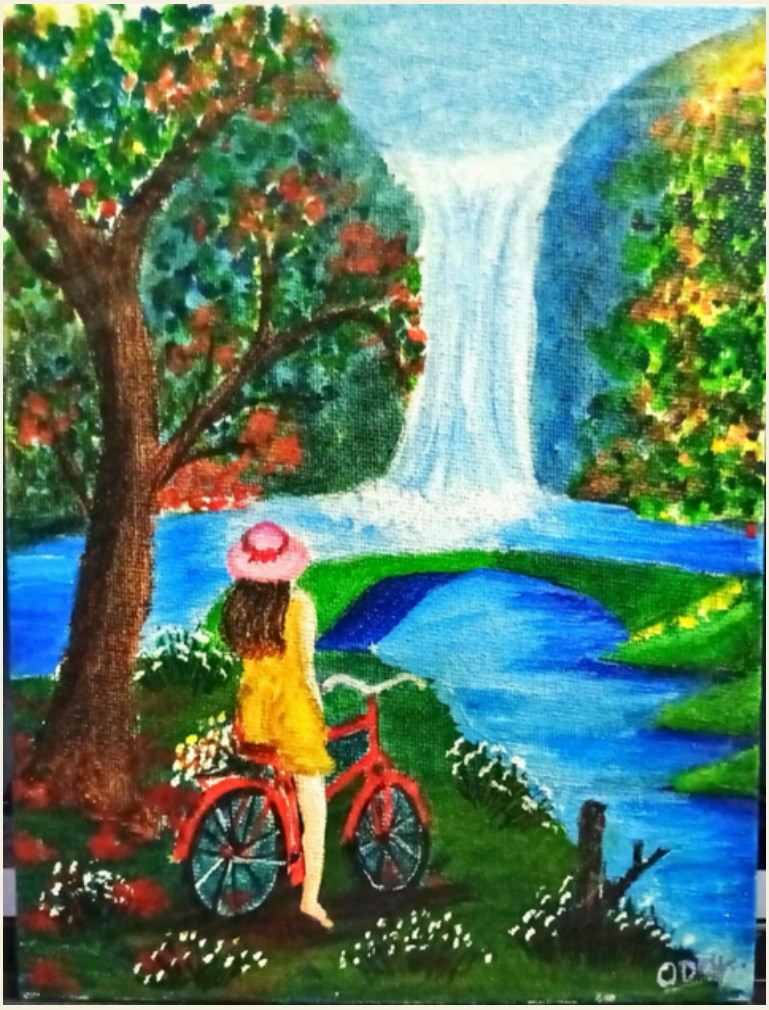

I moved further to explore the entire place and noticed another opening of the cave. Reaching on another end point of the cave I observed a stream was gliding blissfully at its own pace. White flowers bloomed on the little grasses at its bank, were nodding their heads in breeze. That aroma was strongest at this place. I felt the surreal aroma was not coming from the flower rather it was spread all over the atmosphere. Then I realised it was the fragrance of tranquillity which kept me mesmerised for so long. Standing there When I was enjoying this fragrance of tranquillity my mother called me “Wake up from sleep! Get ready for school” and the dream broke.

Author and artist

Omelee Dey

বোহেমিয়ানের ডায়রি

আজ আবার অনেকদিন, অ-নে-ক দিন পর বোহেমিয়ানের ডায়রি লিখছি।

আসলে এখন যেন কেমন একটা হয়ে গেছি। যত দিন যাচ্ছে, আয়ুরেখা যত ঝাপসা হয়ে আসছে, তত যেন মনের ভেতরের অনুভূতির উৎসমুখ চাপা পড়ে যাচ্ছে জাগতিক ভোগ-ঐশ্বর্যের আবর্জনায়। আবর্জনাই বা বলি কি করে? যে জিনিস তার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ার পরেও অনড় হয়ে আপন স্থান দখল করে বসে থাকে, তাকেই তো আবর্জনা বলে। কিন্তু ভোগ-বাসনার দাহিকাশক্তি, যা নিরন্তর দগ্ধ করছে মানুষের অন্তরাত্মাকে, তাকে চালিত করছে সংসারের জীর্ণ থেকে জীর্ণতর গভীরতায়, তার প্রয়োজন কি সত্যিই কখনো ফুরায়? তাকে তো আবর্জনা বলা চলে না। যদি ইন্দ্রিয়সুখ-কে প্রয়োজনহীন ভেবে অগ্রাহ্য করি, তবে তো নিজের সাথেই চরম প্রবঞ্চনা করা হয়। আত্মচিন্তা ব্যতীত নিজের অন্তরে নিরবিচ্ছিন্নভাবে মৃদু অনুরণন তুলে যাওয়া সুক্ষ্ম অনুভূতিগুলোকে চেনা সম্ভব না। সূক্ষ্ম আবেগ, পরিশীলিত অনুভূতি আসলে বড়ই লাজুক, যদি তার দুহাত ধরে পরম স্নেহের কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করা হয়, "কি গো, কেমন আছো?", তবেই সে উত্তর দেবে। নাহলে স্থূল, ঐষণাময় আবেগের তীব্র চিৎকারের ফাঁকে সে লুকিয়েই বসে থাকবে আজীবন। দুদণ্ড চিন্তা করার জন্য দরকার একটু একাকীত্ব, একটু নিস্তব্ধতা। কিন্তু এই দুটিই আজকের দুনিয়ায় দুর্লভতম বস্তু। এন্টারটেইনমেন্ট-এর কোন অভাব প্রগতিশীল পৃথিবী রাখেনি। আমরা সামাজিকভাবে, মানসিকভাবে যতই একা হচ্ছি, ততই আপন হয়ে উঠছে এন্টারটেইনমেন্ট। সময় কাটছে না তো সিনেমা দেখো, বই পড়, ভিডিও গেমস খেলো, সোশ্যাল মিডিয়াটা একবার একটু চক্কর মেরে এসো, নাহয় ইউটিউবে একের পর এক আসতে থাকা ভিডিওর জোয়ারে ভেসে পড় কূলের চিন্তা না রেখেই। বিশ্বাস করুন, আমি নিজেই এই জালে জড়িয়ে আছি। প্রযুক্তিকে দোষ দেওয়া বা সেই বিকেলে পার্কের বেঞ্চিতে বসে বসে আধুনিক সমাজের আদ্যশ্রাদ্ধ করতে থাকা বিশ্ব-খিটখিটে বুড়োদের দলে আমি পড়ি না। কিন্তু তারপরেও মনে হয়, কোথাও না কোথাও যেন এই সুবিপুল পরিমাণ এন্টারটেইনমেন্ট নিজের সৃষ্টিশীলতাকে ক্রমশ ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে। আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, আবেগের সঠিক মন্থন না ঘটলে ঠিকঠাক সৃজন সম্ভব নয়। মানুষের মনের সাগরকে মন্থন করতে পারে একমাত্র আত্মচিন্তা-সঞ্জাত অনুভূতি, আর সেই মন্থন থেকেই জন্ম নিতে পারে অমৃত। কিন্তু একটু নিস্তব্ধতা না পেলে, একটু চিন্তা করার সুযোগ না পেলে কিভাবে নিজের ভেতরের সেই অনুভূতিগুলোর ঠিকানা পাওয়া যাবে? আগেই বলেছিলাম, যত দিন যাচ্ছে, তত আবেগের মৃত্যু হচ্ছে হৃদয়ের বধ্যভূমিতে। পরিবর্তে দিন থেকে দিনান্তরে কেবল বয়ে নিয়ে চলছি ইন্দ্রিয়সুখ-সর্বস্ব, বাসনার বিষে জর্জরিত, আবেগহীন, মনুষ্যত্বহীন এক বিজাতীয়, আদিম কঙ্কাল। ফলে বোহেমিয়ান আস্তে আস্তে স্থবির হয়ে আসছে। কমে আসছে হৃদয়ের সাহারায় কেবলমাত্র অনুভূতির যষ্টি সম্বল করে তার দুর্দমনীয় সাহসিকতার অভিযান....। আচ্ছা, আচ্ছা বেশ, মানছি একটু অতিরিক্ত বাড়িয়ে বলছি আজকে, এতটাও ভালো কিছু সৃষ্টি আমার হাত দিয়ে কখনো হয় নি, আর হবেও না। একা ঘরে খাটের ওপর বসে থেকে 'সাহসিকতার অভিযান' সবাই করতে পারে, সে নিয়ে আর বড়ো বড়ো বুকনি মারার প্রয়োজন নেই। তবে কিনা, আপনার কাছেই তো বলছি তাই না....আপনার কাছে একটু-আধটু নিজের ঢাক পেটানোই যায়, কি বলেন? নাহয় একটু করুণার হাসি হেসে ক্ষমা করে দেবেন.... আপনার কাছে আর লজ্জা কীসের বলুন?

আপনি জিজ্ঞাসা করতেই পারেন, " তা বাবা বাতেলানন্দ, অনেকক্ষন ধরেই তো তোমার ধানাই-পানাই শুনছি। এমনিতেও তুমি মোটেই ভালো কিছু লেখো না, আর সেই লেখা পড়ার ব্যাপারে আমার মধ্যেও বিন্দুমাত্র উৎসাহ কিছু থাকে না। তা চাঁদু, এতো ন্যাকামো না করে খুলে বলো দেখি, আজকে কি নিয়ে ভাট বকবে বলে ভাবছো?" তাহলে বলি, আজকে আমার প্রিয় বিষয়গুলোর একটা নিয়ে আবার একটা লম্বা হ্যাজ নামাবো বলে এসেছি। চলুন, মৃত্যু নিয়ে একটু গল্প করা যাক।

মৃত্যু আমার বড় প্রিয় একটা বিষয়। একইসাথে মৃত্যুকে আমি ভয়ও পাই, আবার তার রূপে মুগ্ধও হই। এ যেন কলেজ জীবনের 'ক্রাশ'। তার প্রতি আপনার আকর্ষণ দুর্নিবার, কৌতূহল অপরিসীম, মুগ্ধতা অপার....অথচ তাকে সামনে পেলেই কোথা থেকে যেন রাজ্যের ভয় আর উৎকণ্ঠা এসে হাজির হয় মনের মধ্যে। হ্যাঁ, মানছি মৃত্যুর সম্মন্ধে আমি প্রায় কিছুই জানি না। সেভাবে খুব কাছ থেকে মৃত্যুকে দেখিও নি কখনো। নিজে নিরাপদ ঘরে, ফ্যানের নিচে, কফির কাপ হাতে নিয়ে মৃত্যু সম্মন্ধে বড় বড় চিন্তা করা বা বাতেলা মারা যেতেই পারে। কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই, মৃত্যু আমাকে আজ পর্যন্ত যতখানি বিস্মিত করতে পেরেছে, অন্য খুব কম বিষয়ই তার সমকক্ষ হতে পারে। মৃত্যু যেন এক বিস্ময়, বিমুগ্ধতার অকূল-পাথার। সেখানে একবার ফেরার ঠিকানা না রেখে ভেসে পড়তে পারলেই হলো, প্রতি মুহূর্তে সে নিজেকে আপনার সামনে উজাড় করে দেবে, তার নিত্যনতুন রূপের ছটায় তাক লাগিয়ে দেবে, রহস্যময়ী রূপসীর মত মোহিনী হাসিতে ভুলিয়ে দেবে যত দুঃখ দুর্দশা। কখনও সে শান্ত, কখনও রুদ্র, কখনও নিষ্ঠুর, আবার কখনও বা জ্বরের তপ্ত কপালে মায়ের শীতল হাতের স্নেহের স্পর্শের মত, সমস্ত না-পাওয়ার কষ্ট, সকল লাঞ্ছনা, সব অপমান মুহূর্তেই জুড়িয়ে দেওয়া এক অসীম নির্ভরতার

আশ্রয়স্থল। প্রশ্ন করতেই পারেন, যদি মৃত্যু নিয়ে তুমি এতই মুগ্ধ, তবে মৃত্যুকে ভয় পাও কেন বাবা? যাও না, একবার ছাদ থেকে লাফ মেরেই দেখো। তুমিও তোমার কৌতূহল নিবৃত্ত করতে পারো, আমারও হাড় জুড়োয়, আর এসব পাগলের প্রলাপ পড়তে হয় না....। নাহ্, সত্যি যদি বলি, তাহলে অস্বীকার করার উপায় নেই, মৃত্যুকে আমি, অন্তত এখনও পর্যন্ত, বেশ খানিকটা ভয় পাই বৈকি। ভয়ের কারণ কি? এক একজন এক একভাবে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কেউ বলেছেন অজ্ঞানতা থেকে, কেউ বলেছেন অস্তিত্ব বিলোপের আশঙ্কা থেকে, আবার কেউ বলেছেন বাসনার অপরিপূর্ণতা থেকে। আমার কি মনে হয় জানেন? দেখবেন, বিকেলে পার্কে গেলে (যেদিকে ওই বদমেজাজি দাদুর দল বসে নরক-গুলজার করে, ওদিকটায় যাবেন না ভুলেও) মায়েরা তাদের বাচ্চাদের খেলার জন্য ছেড়ে দিয়ে নিজেদের মধ্যে গল্প-গুজব করে। তারপর যেই সন্ধ্যে-সন্ধ্যে হয়ে এলো, আশপাশের বাড়ি থেকে প্রথম শাঁখের শব্দ জানান দিল দিনের আয়ু ফুরিয়ে এসেছে, অমনি তাঁরা নিজের নিজের বাচ্চাকে হাত ধরে টেনে তুলে বাড়ির দিকে যাত্রা শুরু করেন। এখন এই বাচ্চাদের মধ্যে দুই ধরনের বাচ্চা থাকে। একদল, যাদের খেলার ইচ্ছে শেষ হয়েছে, তারা সঙ্গীদের হাসিমুখে বাই-বাই বলে আনন্দে নাচতে নাচতে মায়ের সাথে বাড়ির দিকে রওনা দেয়। আরেকদল বাচ্চা, যাদের তখনও খেলার ইচ্ছে পূর্ণ হয় নি, তাদের যখন মা টেনে নিয়ে যান, তখন তারা রীতিমত কান্নাকাটি জুড়ে দেয়, কিছুতেই যেতে চায় না বাড়ির দিকে। মৃত্যু আর মানুষের সম্পর্ক একেবারে ঠিক ওইরকম। লক্ষ্য করবেন, আমি কিন্তু খেলা শেষ হওয়া নিয়ে কিছু বলিনি, বলেছি খেলার 'ইচ্ছা' শেষ হওয়া নিয়ে। ইচ্ছা পূর্ণ না হলে খেলা অনন্তকাল ধরে চলতে পারে, আর ইচ্ছা সম্পূর্ণ হলে সময় শেষ হওয়ার আগেই মন বলে ওঠে, "আর কেন, এবার বাড়ি ফেরা যাক।" আসন্ন মৃত্যুতে একদল মানুষ চরম আতঙ্কিত হয়ে পড়েন, তাঁদের এই চেনা-পরিচিত দুনিয়া ছেড়ে যাওয়ার কোন ইচ্ছাই নেই। আবার কেউ বা সানন্দে হাত বাড়িয়ে দেন সেই অনতিক্রম্য ভবিতব্যের দিকে। কিভাবে বোঝা যায় ইচ্ছা শেষ হয়েছে কি না? এটা প্রত্যেকের নিজস্ব ব্যাপার। কেউ জীবনের সূচনাপর্বেই বিতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে, বেঁচে থাকার সমস্ত ইচ্ছার অবসানান্তে সে বরণ করে নেয় স্বেচ্ছামৃত্যু বা আত্মহত্যা। কেউ বা জীবনকে পরিপূর্ণ উপভোগ করে তবেই রাজি হয় সেই চির-অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিতে। কার, কখন, কিভাবে ইচ্ছা শেষ হবে, কে বলতে পারে? আমার হয়েছে কি? মোটেই না। এখনও ইন্দ্রিয়ভোগের বাসনা পূর্ণ হয় নি, ঐষনা সন্তুষ্ট হয় নি, কতকিছু জানা হয় নি, কতকিছু দেখা হয় নি, বাকি রয়ে গেছে কতকিছু, আর হয়তো বা রয়েও যাবে আরো অনেক। কিন্তু সবার ওপরে আমার বাঁচতে ইচ্ছা হয় কেন জানেন? ভবিষ্যতকে দেখার জন্য, জানার জন্য, ইংরিজিতে বললে এক্সপেরিয়েন্স করার জন্য। সেও তো একপ্রকারের ইন্দ্রিয়সুখ, নিশ্চয়ই। কিন্তু তবুও যেন ভবিষ্যতে কি হলো, মানুষ আরো কত কি করলো, কত কিছু জানলো, কি কি পরিবর্তন হলো, সেসব জানার ইচ্ছা আমার রয়ে গেছে ষোলোআনা। জানি না, হয়তো একদিন দেখবো সংসারের মঞ্চে আমার অভিনয়ের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়েছে অনেকদিন আগেই, মিথ্যাই অনাহুতের মত স্থান অধিকার করে বসে রয়েছি। সেদিন হয়তো বাঁচার ইচ্ছা ফুরোবে, নিজেকে সমর্পণ করবো মৃত্যুর হাতে, যেমন করে সদ্য যৌবনে পা রাখা যুবতী তার প্রথম প্রেমিকের হাতে নিজেকে সমর্পণ করে.....পরম বিশ্বাসে, পরম আশ্লেষে।

ঠিক মৃত্যুর আগে কেমন লাগে? যখন নিশ্চিত হয় মানুষ, তার 'দিনশেষের শেষ খেয়া' এসে পৌঁছেছে তার দ্বারে। আমি ভয় ভীতির কথা বলছি না। সেই অনুভূতি কল্পনা করাটা কঠিন কিছু নয়। কিন্তু নিরুত্তাপ আত্মসমর্পণ, সেটা ঠিক কেমন? কেমন লাগে যখন বুঝতে পারা যায় এবার এই চেনা পৃথিবী ছেড়ে অনন্তের পথে পাড়ি দিতে হবে? আনন্দ হয়?

নাকি নিরুপায় হয়ে 'মেনে তো নিতেই হবে' এই বোধ থেকে অনাসক্তি আসে? আমি ঠিক জন্মান্তরে বিশ্বাসী নই। জন্মান্তর প্রসঙ্গে বিজ্ঞান সেরকম কিছু বলতে পারে নি কখনোই। তাহলে থাকলো পড়ে বিভিন্ন ধার্মিক ব্যাখ্যা। সেখানেও গন্ডগোল, হিন্দুধর্ম একরকম বলছে, ইসলাম আরেক, ক্রিশ্চান বলছে অন্যরকম। সত্যের একাধিক প্রকাশ থাকতে পারে, কিন্তু প্রকৃত রূপ নিয়ে মতভেদ থাকা সম্ভব নয়। থাকলে তা সত্যের প্রকৃত রূপ নয়। সেজন্য, আমি জন্মান্তর সম্পর্কে শুনেছি, পড়েছি, এমনকি যাঁরা মানেন তাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বিন্দুমাত্র কম নয়, কিন্তু আমি নিজে থেকে ঠিক মানতে পারি না। যদি ধরে নি জন্মান্তর নেই, তাহলে মৃত্যু মানে এখানেই শেষ। গভীর ঘুমের মত তলিয়ে যাবো শুন্যতার অন্তরালে। আর যদি জন্মান্তর থাকে, তাহলে আবার নতুন করে আসতে হবে, এই উৎসাহ বা বিষাদ (ব্যক্তি বিশেষে) নিয়ে অপেক্ষা করবো পৃথিবীতে আবার ফেরার। অদ্ভুত একটা উপলব্ধি, তাই না? আমি জানছি ক্রমশ, এই শেষ, আর নয়, এবার যেতে হবে, সময় আসন্ন....। যখন ঘুমোতে যাই, তখনও হয়তো মৃত্যুর মতই প্রাথমিক অনুভূতি হয় বটে, কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস থাকে, আবার জেগে উঠবো, আবার চেনা পৃথিবী, ভালোবাসার মানুষজন, পরিচিত মুখোশধারীদের মধ্যে ফিরে আসবো। কেবল কয়েক ঘণ্টার যা বিস্মৃতি, এটুকুই তো। কিন্তু মৃত্যুর সময় আসন্ন হলে সেই অনুভূতি হবে না। মনে হবে আর কোনোদিন জেগে উঠবো না, আর এই পৃথিবীকে দেখতে হবে না, কর্তব্য করতে হবে না, যাদের ভালবাসতাম, তাদের দেখতে পাবো না, আবার যাদের ভালোবাসার অভিনয় করতাম, সেই অভিনয় থেকেও ছুটি পাবো। অনুভূতি তো বোঝানো যায় না, সেজন্য মৃত্যুর মুহূর্ত না আসলে কোনোদিনই জানতে পারবো না ঠিক কিরকম লাগে। হে নীলকন্ঠ, হে শূলপাণি, আমায় অন্তত এটুকু আশীর্বাদ কোরো, যাতে মৃত্যুর মুহূর্তেও আমার জ্ঞান থাকে অবিকৃত, অনুভূতি থাকে ক্রিয়াশীল। কারণ সেই হবে আমার শেষ জানা, আর তাকে জেনেই পূর্ণ হবে আমার সকল জানার ইচ্ছা।

Written by **Aneek Sanyal**
Photo by **Udita Chaudhury**

Durga Puja - A Celebration of Harmony Across Faiths

Every year, the streets of Dhaka, where I grew up, come alive with the rhythm of dhak drums, the smell of dhuno incense, and the vibrant colors of festivity as Durga Puja begins. The festival, which celebrates the triumph of good over evil, isn't just a celebration for the Hindu community—it's a celebration for everyone, transcending religious boundaries and reminding us of the harmonious fabric that binds us together.

Growing up, I remember how the preparations for Durga Puja would start long before the actual celebrations. The entire neighborhood, regardless of religion, would join hands to create something magical. The artisans—many of them Muslims—would delicately craft the idols of Goddess Durga, and it never felt like they were working on a festival that wasn't their own. There was a shared sense of pride, a collective effort to make sure the beauty of the festival touched everyone's hearts.

Durga Puja is, at its core, a community festival. It's a time when Hindu and Muslim neighbors come together, sharing sweets and stories, lighting lamps, and visiting pandals (temporary stages for the goddess) hand in hand. I remember visiting the local pandal with my friends, some of whom were Muslim, and feeling like it was our collective celebration. We would eat the same prasad, watch the same cultural performances, and stand in awe of the beautifully adorned idols.

In Bangladesh, the unity that Durga Puja fosters each year is a testament to the deep-rooted respect between communities. Despite differences in faith, the festival becomes an opportunity for people to reconnect, appreciate each other's traditions, and share the joy. It's heartwarming to see Muslim families visiting the pandals, offering their good wishes, and sometimes even contributing to the preparations. I recall how, in my childhood, my family's Muslim neighbor would bring us freshly baked bread during the Puja mornings, adding a special flavor to our celebrations.

During Durga Puja, the festival fills the streets with vibrant colors and joyous crowds, creating an atmosphere of unity and shared celebration that brings people together. Streets bustling with people from all walks of life, joining in the processions, capturing memories, and singing songs of unity. The festival reminds us that peace and mutual respect are the threads that keep us together, not only during the Puja but all year round.

What's even more beautiful is how this spirit of togetherness has spread beyond Bangladesh. Across the world, from Kolkata to Virginia to London, Durga Puja unites communities, regardless of where they are. In these global celebrations, we see people of different cultures and faiths coming together, continuing the tradition of harmony. Whether in the heart of Dhaka or in the distant pandals of London, the message remains the same—unity in diversity.

Durga Puja, in Bangladesh and globally, is not just about religion. It's about the warmth of shared moments, the beauty of cultural exchange, and the simple, powerful joy of being together. Each year, it rekindles memories of a childhood filled with laughter and love, and of a future that continues to embrace harmony across faiths. And as the goddess returns to the heavens, so does the hope that the bonds we create during this festive season will last long after the celebrations end.

Written by **Raisa Rahman**
Photo by **Rahan Singha Roy**

C/O ফুটপাথ

আমার রোজকার যাতায়াতের পথ
নাগের বাজারের মোড়ে
উড়ালপুলের নীচে দেখি এক
যুবতী পাগলী এসে জুটেছে।
দেখে মনে হল খুব বেশীদিন
ঘর ছাড়েনি।
গায়ের রঙ বেশ ফর্সা
ধুলোমাটির প্রলেপ তেমন পড়েনি।
মাথার চুলও ততটা রুক্ষ নয়।
পরনের কাপড়খানি আধময়লা।
শরীরজুড়ে অবাধ্য যৌবন।
একটা পুঁটুলিতে মাথা রেখে
একমনে বিড়বিড় করে চলেছে।
কখনও হাসছে আবার কখনও হাততালি দিয়ে উঠছে।
দেখে বড় মায়া হল , একটু দূরে দাঁড়িয়ে
দেখতে লাগলাম পাগলীর কর্মকাণ্ড।
দুঃখ পেলাম ভেবে যে
এই পাগলী হয়তো কারো ঘরের বউ ,
কারো মা অথবা কারো বোন।
লক্ষ্য করলাম বহু কামার্ত চোখ
আশপাশ থেকে পাগলীকে যেন গিলে খাচ্ছে।
এরাই কোনদিন রাতের অন্ধকারে
দখল নেবে পাগলীর শরীরের।
পাগলী হয়তো চেঁচাবে
মুখে কাপড় গুঁজে দেবে তার।
পাগলী হয়তো বুঝে বা নাবুঝে
বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবে
তখন হাত পা বেঁধে
চলবে পাশবিক অত্যাচার।
দিনের পর দিন
মাসের পর মাস এইভাবে চলতে চলতে
পাগলী হয়তো একদিন গর্ভবতী হবে।
দশমাস দশদিন বাদে
পাগলীর কোল আলো করে
এক ফুটফুটে শিশু জন্ম নেবে।
যার মা থেকেও নেই আর
বাবা তার কামনা চরিতার্থ করেই খালাস।
আর শিশুটির ঠিকানা তখন
C/0 ফুটপাথ।

Written by **শ্রাবণী চৌধুরী**

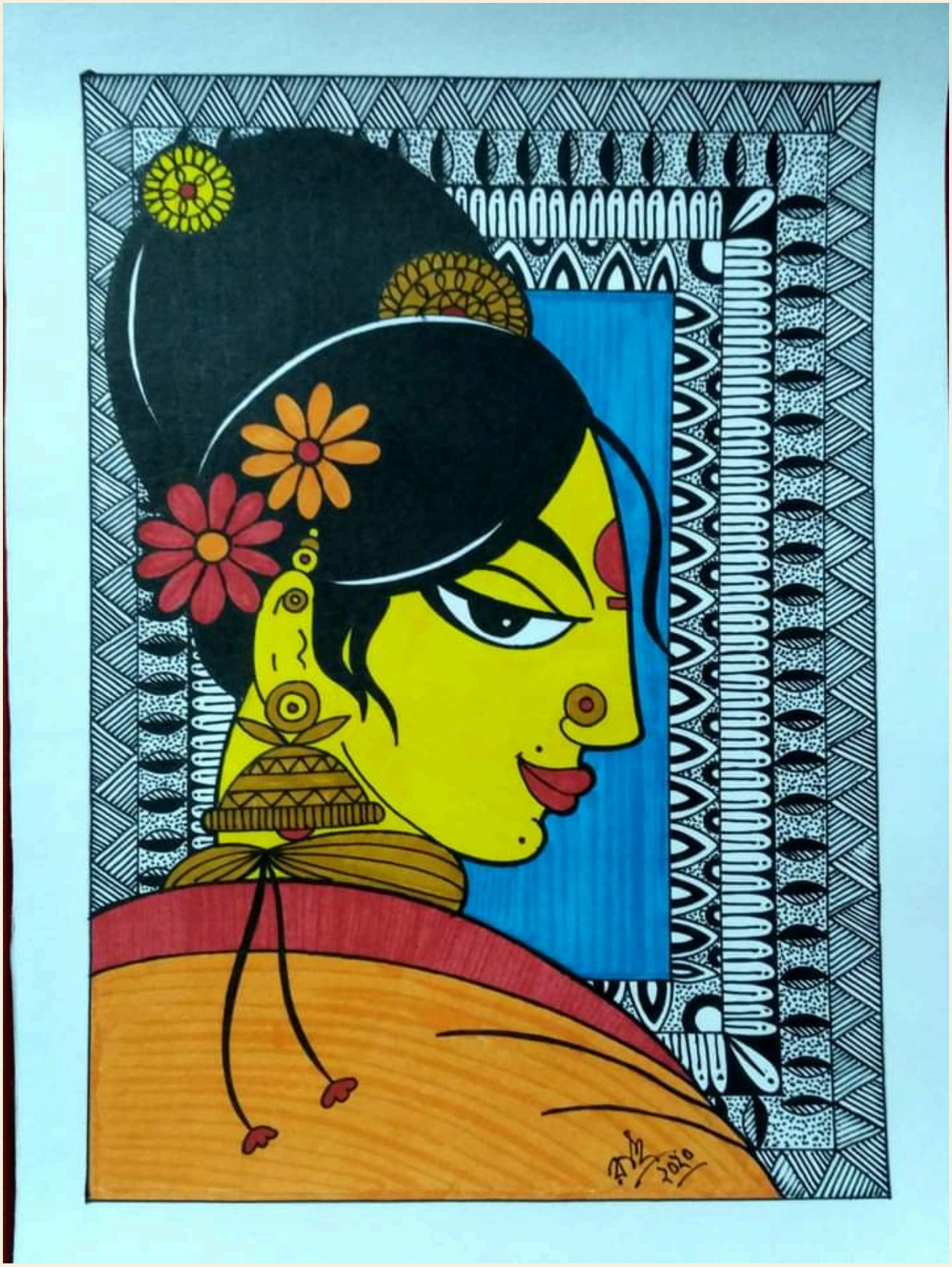

Art by **Raita Ganguly**

আর কবে তুই

উৎসবেতে উৎসাহ নেই
আগমনি বেসুর,
কাশ দোলে না মন দোলে না
প্রফুল্ল তাই অসুর?
বানের তোড়ে বাঁধ ভেঙেছে
গেছে খুশি ভেসে,
ডাক্তাররা আজ নিগৃহীত
মা আজ তুই কোন দেশে?
অভয়ারা নির্যাতিত
তবুও তুই পাথর,
প্রতিবাদের মন্ত্র শত
পাথর তবু নিথর?
বানভাসিদের আর্তি বুঝি
পৌঁছোয় নি তোর কানে,
নারী–সম্মান লুণ্ঠিত আজ
বুঝিস না কি মানে?
আর কবে তুই ধরবি আয়ুধ
করবি অসুর বিনাশ,
আর কবে তোর ন্যায়–পাখিটা
দেখবে মুক্তির আকাশ?

Written by **Rabindranath Pradhan**
Art by **Prince Roy**

শরতের নানা রঙ

শরৎ মানে শুধুই কি শিউলি আর কাশের মেলা ।!
শরৎ মানে শুধুই কি নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা !
যে ছোট্ট ছেলেটা ছেঁড়া জামা গায়ে দিয়ে
পথে পথে বেলুন বেচে তার বেলা !
যে ছেলেটা সকাল থেকে সন্ধ্যে
চায়ের দোকানে ফরমাশ খাটে তার বেলা !
যে বাচ্চা মেয়েটার শৈশব চুরি যায়
বাবুদের গেরস্থালির কাজ করে তার বেলা !
যে সম্বলহীন বাবা উদয়াস্ত খেটে চলে
ছেলেমেয়ের মুখে দুমুঠো ভাত তুলে দেবার জন্যে
তার কাছে শরৎ মানে কি !
যে অসহায় মা সারাবছর গায়ে গতরে খেটেও
শারোদৎসবে ছেলেমেয়েদের নতুন একটা জামা কিনে দিতে পারেনা
তার কাছে শরৎ মানে কি ?
এদের কাছে শরৎ হল বড় বেশী বাস্তব
আর রোজকারের জীবন সংগ্রাম ।
শরতের মেঘ নীল কি কালো !
শরতের ফুল শিউলি কি কাশ !
তা দেখার তাদের নেইতো অবকাশ ।

Written by **শ্রাবণী চৌধুরী**

রাতকাহিনী

নিঝুম রাতে মেঘের আড়াল থেকে
মুক্তোঝরা আলো ছড়িয়ে
মুখ বাড়ায় রূপালী চাঁদ ...

নিঝুমরাতে জনহীন ঘাটের সাথে
মনের কথা বলে নদীর জল
তার উৎস , বিস্তার আর সাগরে হারিয়ে যাওয়ার গল্প ...

নিঝুম রাতে ভাঙা কুঁড়েঘরে
জ্বালানি তেলের অভাবে ঘুটঘুটে আঁধারে
খিদের জ্বালায় কেঁদে ওঠে দুধের শিশু ...

নিঝুম রাতে ভাঙাচোরা একতলা বাড়িতে
জেগে দুজন অশীতিপর বৃদ্ধ বৃদ্ধা
না জানি কখন হারিয়ে যাওয়া ছেলের খোঁজ আসে ...

নিঝুম রাতে নব বিবাহিত রাত পাহারার ছেলেটি
ঘুরে ঘুরে সারা পাড়া পাহারায় ব্যস্ত
বাড়িতে তার স্ত্রী একা বিছানায় নির্ঘুম রাত কাটায় ...

নিঝুম রাতে নিষিদ্ধ পল্লীর ঘুপচি ঘরে
একের পর এক শরীর বেচার খেলা
অসহায় মেয়েটির চোখে জল রুগ্ন শিশুর কথা ভেবে ...

নিঝুম রাতে বউ ছেলে মেয়ের সাথে ঘুমন্ত অফিস বাবু
হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে ঘড়ি দেখে পাশ ফিরে শোয় আর ভাবে
ভোরে উঠেই নাকেমুখে গুজে সাড়ে সাতটার ট্রেনটা ধরতে হবে ...

নিঝুম রাতে অভিজাত এলাকার বহুতলে
মদ ,হুল্লোড় আর খাওয়া দাওয়ায়
জন্মদিনের পার্টি জমজমাট ...

Written by **শ্রাবণী চৌধুরী**

শেষগতি

ইলেকট্রিক চুল্লীর গনগনে তাপে
জ্বলছেন তিনি ।
তিনি কারো মা , কারো বোন বা দিদি
অথবা কারো ভাগ্যহীনা বিধবা ।
বহুদিন অসুখে শয্যাশায়ী ছিলেন
আজ পেলেন মুক্তি ।

চুল্লীর ভিতর আস্তে আস্তে
আগুন গ্রাস করছে তাঁকে ।
আর কিছুক্ষণ বাদেই
একমুঠো ছাই
আর তারপর অস্থি কলসের
গঙ্গায় মিশে যাওয়া ।

কোনো পিছুটান রইল না
ছিঁড়ে গেল সব জাগতিক বন্ধন
শুরু হল অমৃতলোকে যাত্রা
পাপ পুণ্যের হিসাব বুঝে নেওয়ার পালা
অখণ্ড স্বর্গবাস
নাকি নরক দর্শন !

গঙ্গার পাড়ে দাঁড়ানো ছেলে মেয়েরা
মায়ের সম্পত্তির বাটোয়ারা নিয়ে ব্যস্ত ।
মায়ের রেখে যাওয়া গহনার ওজন কত
ব্যাংকেই বা জমা আছে কত !
কে কতটা মায়ের জন্য করেছে
তার ওপরেই ভাগের দাবি ।

কেবল মা গঙ্গা নির্লিপ্ত
বয়ে চলেন
আর যেন তাদের উদ্দেশ্যে
মনে মনে বলেন , ভুলিস না
তোদের শেষ আশ্রয়ও
আমারই বুকে ।

Written by **শ্রাবণী চৌধুরী**

গল্প

কতক্ষণ এভাবে ছুটছে সে তা আর তার নিজেরই মনে নেই। শুরুটা কীভাবে হয়েছিল সেটা মনে আছে যদিও। মৃত্যুভয়। চোখের সামনে চেনজন সবাইকে আস্তে আস্তে পাল্টে যেতে দেখেছিল সে। এরকমটা হওয়ার কথা ছিলনা কিন্তু। ওরা সবাই বহুদিন ধরে ঘুরে যেখানে থেমেছিল সেখানে যে এমন ঘটনা ঘটবে তা কেউ কল্পনা করেনি। দলের মধ্যে সবচেয়ে বয়স্ক যে সে তখন মুরুব্বির মতোই বলেছিল "তাকিয়ে দেখো চারিদিকে, শেষ কবে এখানে বৃষ্টি হয়েছিল তা বলতে পারবে?" কেউ পারেনি, প্রাণের কোন চিহ্নই চোখে পড়েনি তো পারবে কী করে বলতে। হলুদ বালিতে রোদের আলো পড়ে ঝলসে যাচ্ছিল চারিদিক। অনেকদিন পর শান্তিতে ঘুমিয়েছিল আবার সে।

এখন ছুটতে ছুটতে তার আর কিছুতেই মনে পড়ছে শেষ কবে ঘুম পেয়েছিল তার। বহুদিন হয়ে গেলো সেই মৃত্যু উপত্যকা থেকে পালাচ্ছে সে। একেক সময়ে ভেবেছে থেমে যাবে, কিন্তু কোন এক অজানা ভয়ে সে থামেনি। কত দেশ-মহাদেশ-নদীনালা পেরিয়েছে সে তার আর হিসেব নেই। আর কি থামতে পারবে সে কোনওদিন? হঠাৎ চিন্তার সুতো ছেঁড়ে তার। এরকম নীল আকাশ সে অনেকদিন দেখেনি। গতি কমায়, কিন্তু থামে না সে। এক দুজনকে ইতি উতি ঘুরতে দেখেছে সে। দূরে একটা নদীও চোখে পড়েছে তার। অত নিচুতে ওগুলোও মেঘ নাকি? ভালো করে তাকাতে বুঝেছে মেঘ না, পেঁজা তুলোর মতো সারি সারি ফুল ওগুলো। নিজের অজান্তেই গতি মন্থর হয়ে গেছে তার আরও। আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছে কয়েকজন। সন্দেহের দৃষ্টি তাদের। কিছু কী হয়েছে নাকি? এতদিন ঘুরছে সে, চেহারায় পরিবর্তন আসবে স্বাভাবিক। কিন্তু কতটা সেটা? জানার জন্য পরিষ্কার জলের দিকে এগোয় সে।

এগোতেই ধরতে পারে গণ্ডগোলটা। যে মারণরোগ কেড়ে নিয়েছিল ওর চেনাজানা সবাইকে, মৃত্যুর মতো ঝরে পড়েছিল তারা ওই বিশাল বালির উপত্যকায় যে কারণে, তার থেকে পালাতে পারেনি সে আর। তার সাদা শরীরের জায়গায় জায়গায় কালো ছোপ। এতদিন চোখে পড়ার অবকাশ হয়নি তার। আর কতদিন পাবে সে? নাকি কতক্ষণ?

এই ক'দিনে বেশি ঘোরেনি আর সে। ঘুরতে পারেনি। কালো ছোপগুলো সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে এখন। ভারী হয়ে আছে তার শরীর-মন সব। থেকে থেকে কীসব মন্ত্রধ্বনি আর নেশা ধরানো সুর কানে আসছে। খুব ইচ্ছে করছে হাল ছেড়ে দিতে। কারা যেন তার আসন্ন মৃত্যুর জন্যই এই আয়োজন করেছে। এখনই মৃত্যু চলে এলে সে বুঝবেও না যে স্বপ্ন দেখছে না সত্যি। কষ্টে চোখ বেয়ে জল নেমে আসছে। আর কিছুক্ষণেই মিলিয়ে যাবে সে। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থাতে অনেক দূর থেকে কানে এলো তিনটে শব্দ তার, কোন্ প্রাগৈতিহাসিক উচ্চারণ সেই শব্দমালার? কী এর মানে?

ছাতাটা সঙ্গে নিয়েই বেরিয়েছিলেন অবনীবাবু। বাজারের কাছাকাছি আসতেই অনুভব করলেন অবাঞ্ছিত কিছু জলবিন্দুর স্পর্শ। কেউ যেন কথার বেগে থুতু ছিটিয়ে দিয়েছে বাতাসে। খানিকটা হতাশ হয়েই উপরের দিকে তাকালেন তিনি। যা ভেবেছিলেন তাই, বেয়াদব কালো মেঘটা মাথার উপরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। মেঘ আর আবহাওয়া দপ্তর কে দুটো কষে গালাগাল করে ছাতাটা খুলতে শুরু করলেন তিনি। ক্লাবের ছেলেগুলো ক্যারাম খেলতে খেলতেই কোনও এক আদিম অপ্রাকৃত কারণে একসাথে চেঁচিয়ে উঠল- " আয়! আয়! আয়! " নেই কাজ তো খই ভাজ একেই বলে। মাথার উপরে যখন ছাতাটা মেলে ধরেছেন অবনীবাবু তখন জোর বেড়ে গেছে বৃষ্টির। "এবারের পুজোটাও ভাসালো" বলতে বলতে মাছের দোকানের দিকে এগোলেন বেহালা আর্য্যবিদ্যামন্দির স্কুলের ভূগোলের মাস্টার অবণীবাবু।

--- কলিকাতার প্রাচীন উপকথা

গোত্রহীন

শহর জুড়ে আকাশ ছোঁয়া সুরম্য সব বাড়ি
পথের ধারে দাঁড়িয়ে সারি সারি ।
ঢাকা পড়ে নীল গগনের মুখ আলোর গানে , অসীম টানে উথলে পড়ে সুখ ।
এক শিশু জন্মেছে কাল রাতে
ঠিকানা তার আলো - আঁধারের ফুটপাতে ।
চাঁদের আলোয় আলোকিত তার মুখ
ধরার মাঝে রয়েছে যত সুখ ।
মা তার গিয়েছে ফেলে তাকে
একলা করে শহরের এই ফুটপাথে ।
জনারণ্যে আজ সে বড় একা
পায়নি কোনো যশোদা মায়ের দেখা ।
তবুও এই ধরা মাঝে , আনন্দেরই সানাই বাজে ।
ভরসা জাগে , ঠাঁই পাবে সে
কোনো জননীর বুকের মাঝে ।

Written by **কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী**

Photo by **Udita Chaudhury**

ছবি

প্রতিসাম্য বিষয়টি পড়া শুরু করেছিলাম স্নাতকোত্তরে। অণু, পরমাণু, রসায়ন, বন্ধনী, যোজ্যতা সবকিছু মিশিয়ে একটা বেশ জগাখিচুড়ি ব্যাপার। তো সেখানে বেশ সুন্দর কিছু কথা শিখেছিলাম যেরকম পুরো পৃথিবীটাই অপ্রতিসাম্যতায় ভর্তি। অন্তত জগজ্জননী প্রকৃতি তো এরকম ভাবেই আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। ব্যাপারটা অনেকটা সমুদ্রের কিনারায় এক মুঠো বালির মতন। যদি হাত ভর্তি করে তোলা হয় তাহলে কিছু বোঝা যাবে না কিন্তু আস্তে আস্তে যদি পরিমাণ কমানো হয় এবং চোখ বড় করে তাকিয়ে থাকলে বোঝা যাবে যে এক মুঠোর মধ্যে থেকে দানাদানা বালির আকৃতি আস্তে আস্তে আলাদা হয়ে চোখে ভাসছে। এ প্রসঙ্গের অবতারণা এমনি এমনি নয়। যেমন ধরুন ছোটবেলার প্রেম থেকে শুরু করে প্রথম প্রিয় উপন্যাস। আচ্ছা থাক, আজকে বরং দ্বিতীয়টা নিয়ে দুএকটা কথা বলি। সমরেশ বসু ভালো লাগতো ঠিকই কিন্তু সব মিলিয়ে ওই নিষিদ্ধ ছোঁয়ার মতন বিবর প্রজাপতিতে আটকে ছিলাম বছর ষোলো অব্দি। তারপরে টুকটাক এদিক-ওদিক চেষ্টা করলেও সুযোগ পাইনি পড়ার মতন কিছু। ছবি নিয়ে আগ্রহ ছিল ঠিকই কিন্তু পারতাম না আঁকতে আর সাবেকি সাহিত্যিকের মতন মিথ্যা সত্যি খেলার সাহস কোনো কালে ছিল না। তাই যখন ভ্যান গগের কান কাটার কথা শুনেছিলাম, ভীষণ নায়কের ভাবে মনে হয়েছিল এরকমই তো হওয়ার দরকার। সাহিত্য চলবে শুধুমাত্র সাহিত্যের জন্য, সেখানে জীবনের ধারা এনে বেখেয়ালি তাকে পদচ্যুত করার কোন মানে হয় না। প্রেমের জন্য কান আর সৃষ্টির তাগিদে রাত্রি তারারা, এরকম ভাবেই ভীষণ গতিতে ছুটবে ঘোড়া। ভাববেন না যে আমি এরকম ভাবে কেন চলছি, কারণ তখনো অবধি বিশৃঙ্খলা কে শৃঙ্খলার জালে আটকে সমতা বিধান করে চলতে শিখিনি। তখনো আমার কাছে নারী শরীরের দুই স্তন একে অপরের বিপ্রতীপ পার্শ্ব প্রতিবিম্ব। সময় এগলো, ততদিনে রতিক্রিয়া এবং সৃষ্টির ইতিহাস আস্তে আস্তে বিরক্তির পর্যায়ে। ভাস্কর্য থেকে ছবির পাতায় অন্য তুলির আঁচড় খুঁজতে গিয়ে আবার সমরেশে মুখ থুবড়ে পড়লাম। ঠিকই ধরেছেন আপনারা, রামকিঙ্কর, লাল মাটি, তুলি, নতুন মাটি আর সৃষ্টির নেশা। ভুলে গেছিলাম যে কি করে বাঁচতে হবে এত কিছু জীবন্ত অসাম্যতার মাঝে। আসলে লোকটা এত ভালো গল্প বলেছে পেছন থেকে, যে দুর্গা প্রতিমার দিকে চেয়ে সৃষ্টি সুখে নতুন স্পর্শ ভুলেছি, খালি দেখছি তেল জল না মিশে সুন্দর বাঁধ মন্দির ঘর হাত চিরুনি তৈরি হচ্ছে। কোথায় যে গেছিলাম কি করেছিলাম ওই কটা দিন, বুঝতে পারিনি। আবার ফেরা সেই বইয়ের পাতায় তবে অন্যভাবে ততদিনে শিক্ষা হয়েছে আস্তে আস্তে পড়ার বইয়ের বাইরে মানতে শিখে গেছি যে না এক হাত আর এক হাতের সমান নয়। কিছুতেই মানতে পারলাম না, কেন জানেন? মাথার ভেতরে জট পাকিয়ে থাকা চিন্তাগুলো কিছুতেই ছাড় দেয় না তার নিজের প্রতিবিম্ব কে। যতই ভাবি যে আস্তে আস্তে ঘর বাঁধবো একটা নতুন পিরামিড, নতুন ঘনকের পাশে, ত্রিমাত্রার নির্দেশকগুলো কিছুতেই মাপকাঠিতে তাকে শান্তিতে বসতে দেয় না। হারিয়ে আমি যাইনি, খুঁজতে গিয়ে অসীম দ্বন্দ্বে ভুগেছি। আচ্ছা অজন্তা ইলোরার ছবি যখন শিল্পীরা এঁকেছেন কিংবা দক্ষিণ ভারতীয় কারুকার্য, অসামান্য চিন্তার মাঝে কারিগরদের মাথায় কি একবারও আসেনি যে আয়নার পাশে আরেকটি কে দেখলে কেমন লাগে? না ভাবতে চেয়েও পারেননি তারা। আসলে অজাচিতভাবে কলমের ডগায় যদি সৃষ্টিচিন্তা ভাসে তাহলে তাকে স্পর্শকাতর না করে এগিয়ে যাওয়াই মঙ্গল। অন্তত আমি তো সেটাই মনে করি। আচ্ছা কাজের কথায় ফিরি।

এত কিছু চিন্তা করে দিনের শেষে সব অণুই সাম্য প্রতি সাম্যের খেলায় ভেসে চলে। অংক আছে কিছু, ভীষণ জটিল অংক, কিন্তু তাই বলে তো সত্যিটা মিথ্যে হয়ে যায় না কিংবা আমার চিন্তাকে আপনি বলপূর্বক প্রলাপ বলতে পারেন না। তেল জল মিশিয়ে ছবি নাই আঁকা যেতে পারে, কিন্তু জল রঙ আর তিন রং ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। কত কিছু অশ্লীলতার দায়ে চাপা পড়ে থাকে, চোখ মেলে দেখলে কিছুটা জীবনরীতি আর কিছুটা মার্গ দর্শন।

পুরুলিয়া যাব একদিন। লাল মাটির দেশে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকবো পাহাড়ের দিকে। যত পাথর আছে, তত রং আছে, তত সৃষ্টির তাগিদ; কিন্তু শিল্পীর ছবি আর আমাদের জীবন ভাবনা এক মার্গে মিলবে না এটাই স্বাভাবিক, এটাই প্রত্যাশিত। আচ্ছা জানেন সমান্তরাল সরলরেখার বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা দেয়া যায়, যেরকম দুটি রেখার মাঝে দ্বিতলকোণ অনির্ণীত, অথবা দুটি রেখা যদি অসীমে গিয়ে মেশে। এখন সীমাহীন উচ্চতার মাত্রা ধারণ করা ব্যক্তিবিশেষে সম্ভব নয় ঠিকই কিন্তু লেখকের কল্পনায় বাস্তব অস্তিত্বকে যদি সময়ের মাত্রায় ভেঙেচুরে নতুন পর্যায় দেওয়া যায় তাহলে শিল্পী এবং বিজ্ঞানী একসাথে চলবে বলেই ধারণা। কিরকম ভাবে কল্পনার ছবিতে অপ্রতিসাম্যতা আসতে শুরু করল ভাবার আগেই সম্পূর্ণ তেল রংটা তৈরি। এটা নিয়েই ভাবছিলাম যে চিত্রকল্পনা আর চিত্তকল্পনা এক না হলেও বাস্তবের অনুগুলোর মতন সুন্দরভাবে নিজস্বতা ও প্রতিবিম্বের মাঝে বেঁচে থাকে।

Written by **Kushal Chakraborty**
Art by **Soumika Saha**

শারদীয়াকে...

#১
পেলব পাপড়িটি আনমনে এসে নামে।
তাকে আজ ঘরে আনব, এমন ঘর তো নেই।
বসন্তসেনা নিরুদ্দেশ, কিছু ইতস্তত পাতা
শুকিয়ে গিয়ে জানান দিয়ে যায়, বাস্তবে তারা ছিল।
গাছের বাকল জ্বলে যায় ঝলসানো রোদে,
এমন সময়ে তুমি এলে,
বলো তোমায় বসতে দিই কোথায়?

#২
লেখা হবে ক্ষুরধার। ফ্যাত-ফ্যাত-সাই-সাই। হারবার্ট সরকার। সমস্ত রকম ধুম-তা-না-না-না পেরিয়ে অপরাজেয় জুলফিকার রক্তস্নান করবে। করবে, মাঝরাত্তিরে চাঁদের কাস্তে ধারালো হয় আসতে আসতে।

এইসব ভেবে-টেবে দরজা খুলে বেরোই। চোখ বুজে ডানা মেলে উড়ে যাই সেই দেশে। মিনিট খানেক পরে গন্ধ তেলচিটে লাগে। ব্যাটারি ফুরিয়ে গেল? এরই মধ্যে? এমন অধঃপাতের কথা তো লেখে নি ডিস্টোপিয়ার টেক্সট বইতেও। তাহলে?

চোখ যায় মেঝের দিকে। কী করে হবে! একপাটিই জুতো। ছেঁড়াখোঁড়া। জাদুর পাটিটি নিরুদ্দেশ! উপকথার বালিকা নিয়ে গিয়েছিল একদিন, তারপর ফেরত দেয় নি আর। রাজপুত্রের মনের সাথে সাথে, হালে জানলাম আমার ছেঁড়া জুতোর পাটিও রয়ে গেছে। সিন্ডারেলার নামে অভিযোগ লিখে রাখছি সেই থেকে!

#৩
এইবারে লেখার গা থেকে খসে পড়ুক ঝুল-কালি। যে চোখে তাকানো যায় না তোমার দিকে, চোখের কোলে কালি, অমন চোখ আমি খুলে রেখে আসি ময়ূরাক্ষীর ধারে। বিচ্ছিরি সব ধুলো-ঢাকা রাতের পরে হঠাৎ চোখে কেমন আলো এসে লাগে। চোখ ছলছল করে ওঠে। কী ভুলই না করেছি অ্যাতোদিন অন্য-অন্য-অন্যত্র বয়ে গিয়ে। তুমি কেমন স্টেশনে আমার জন্যে বসেছিলে। আমি সে কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে অফিস-টাইমের ট্রেন ধরে দূরে চলে গেলাম কীভাবে?

আমার গ্লানির দেশে তোমাকে মনে পড়ে। দুইয়ে দ্বন্দ্ব হয়, দুইয়ে মিলন। কহেন কবি কালীদাস। যেখানে মনে বসে না, যেখানে আদর নেই, সেখান থেকে পাল্যাব এইবারে। আর যেই দুয়ো দিক, জানি, তুমি জানতে পারলেই বলবে, আমাদের পৃথিবীটা অনেক বড়। এই সব ছোটো মানুষ, এরা কতটুকু? কাল-কালাতীত কাল পেরিয়ে যে জীবন, যে অনন্তের পদযাত্রা, তার পালানোর হিসেব এই মানুষ রাখে! হাহ!

সেই ভরসায় আছি। কখনো বিপথে যদি, ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি, অমনই সে মুখ দেখি, শরমে সে হয় সারা। তুমি আমার লজ্জা হও, তুমি আমার লজ্জাবস্ত্র হও। এই দ্যাখো, গা থেকে খুলে রাখছি অপমানের সমস্ত পোশাক। এদেরকেই নাকি মহার্ঘ্য জ্ঞান করেছি এতদিন!

ভুল ভেঙে যায়, দ্যাখো। প্রণত হই। যা দেবি সর্বভূতেষু, লজ্জারূপেন সংস্থিতা...

Written by **চিরায়ত ভট্টাচার্য**
Photo by **Sampurno Sarkar**

ঠনঠনিয়ার দত্ত বাড়ি

খেলাত ঘোষ ভবন

খেলাত ঘোষ ভবন

জোড়াসাঁকো দাঁ বাড়ি বন্দুকওয়ালা

দর্জিপাড়া মিত্র বাড়ি

শিবের সঙ্গে কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী
আশ্বিন মাসে বাপের বাড়ি আসেন ভগবতী

Photographs by Sayak Nag

রিক্সায় কোনো রিক্স নেই

রিকসা কি? উৎসবে ব্যসনে দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে, কর্তব্যে অবিচল থেকে যে দ্বিচক্র বা ত্রিচক্র বিশিষ্ট যানটি পরাক্রমের সাথে আমাদের পরিক্রমার সাথী হয়ে ওঠে, সেটিই রিকসা। নগরজীবনের এই অটুট বস্তুটির বিভিন্ন অবতারের অবতারণা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে হয়ে থাকে, যেমন সাইকেল রিকসা, হাতে টানা রিকসা, ভ্যান রিকসা ইত্যাদি।

আধো মফস্বল থেকে শহরের দিকে পা বাড়ানো যে অঞ্চলে আমার বাস, তার চারপাশে সাইকেল রিকসা প্রজাতির প্রচুর রিকসা চোখে দেখার এবং চেখে দেখার বেশ সুযোগ হয় আমার, তার মধ্যে বর্ষায় ছাতাওয়ালা রিকসা, সিটের উপর কাঁথাওয়ালা রিকসা, হ্যান্ডেলে রেডিও ঝোলা রিকসা, প্যাডেলে টুনি লাগানো রিকসা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তবে বিশিষ্ট হচ্ছেন এই রিকসার চালকবৃন্দ। একবর্গের চালকদের দেখে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায়, রুপোলি পর্দায় যদি সুযোগ পেতেন, বোম্বাই আজ এনার নামেই কাঁপতো, অথবা ছেঁড়া প্যান্টের পকেটে গহিনে লুকোনো সেলফোনে সুরেলা 'টুনির মা' অথবা ঝোলানো রেডিওতে "ভেঙ্গে গেছে সসপ্যান, কেন করিস ঘ্যানঘ্যান" গোছের সঙ্গীত যে রাস্তার মাধুর্যহীনতাকে ছাপিয়ে আরোহীকে এক অনাবিল আনন্দ দেওয়ারই নিবিড় প্রয়াস, সেই ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ। কাজেই ছুটকো কাজের ফাঁকে দু-দশটাকা খসিয়ে একবার রিকসাবিহারের সুখ কেই বা ফেলে দিতে পারে? আমিও পারি না, মাঝেমাঝেই মনে হয়, একবার রিকসা চেপে বেড়িয়ে আসি। রিকসায় চাপলেই নিজেকে কেমন সিরাজ মনে হয়, নিজে কখনও আমি পালকি চড়িনি, তবে আমার বদ্ধমূল ধারণা সেকালে পালকি চেপে যে রাজা রাজড়ারা ভ্রমণ করতেন, তাদের পালকি চড়ার সুখ, রিকসা চড়ার দৈবসুখের কাছে নেহাতই নস্যি। কিন্তু বাধ সাধে ওই চালকবৃন্দই, একবার আধকিলোমিটার মত রাস্তা পাড়ি দেওয়ার জন্য এক চালক ভদ্রলোক আমার কাছে পঁচিশটাকা দাবি করেছিলেন, পকেটের মায়ায় আমাকে সেদিন রিকসা-নবাব হওয়ার সৌভাগ্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতেই হয়েছিল।

আমাদের পাড়ার অনতিদূরে, এলাকার ক্ষুদ্র পরিধির ভিতরেই এক কেশহীন গম্ভীরমনস্ক রিকসাচালকের অবাধ বিচরণ আমি ছোটবেলা থেকেই লক্ষ্য করে এসেছি, একদিন সাতসকালে (কি মরতে মনে নেই) হঠাৎ করে খড়দহ যাবার বিশেষ প্রয়োজন মনে করেছিলাম। বাড়ি থেকে অনেকখানি সময় হাতে করে বেরোনোর বদভ্যাস আমার কোনোদিন নেই, কাজেই চটজলদি বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছানোর অকাট্য হাতিয়ার হিসাবে এই উক্ত ভদ্রলোকের রিকসাটিকে আমি সম্বল করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু শীতের ভোরে ছ'টার সময় উনি মুখের গাম্ভীর্যের গূঢ় ছাপকে একটুও মলিন হতে না দিয়ে বলেছিলেন "আমার ভাড়া আছে"। যদিও সেই কাক না ডাকা ভোরে ওনাকে যে "বুক" করেছেন, তাঁর বুকের পাটার এবং নিদ্রা-অনাসক্তির ভূয়সী প্রশংসা করা ছাড়া আমার কোনো গতি ছিল না; কিন্তু তারপরে যতবার ওনাকে এইরকম সঙ্কটাপন্ন মুহূর্তের আশ্রয় করে তোলার চেষ্টা করেছি, উনি স্থিতিশীল রিকসা নিয়ে জবাব দিয়েছেন "ভাড়া আছে" আর গতিমান রিকসা

নিয়ে জবাব দিয়েছেন "তাড়া আছে"। তাড়া এবং ভাড়ার এই অবিচ্ছেদ্য মায়ার বাঁধন ভেঙ্গে একদিন কোন মন্ত্রবলে তাঁর রিকসায় আমি সওয়ার হয়েছিলাম জানি না তবে প্রচলিত ভাড়া দশটাকার পরিবর্তে উনি আমার থেকে তিরিশটাকা দাবি করেছিলেন, আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে আজ তো পুজো নয়, সামনে ভাইফোঁটা বা ঈদ নয়, ভোট নেই বা বৃষ্টিও হয়নি, তাহলে হঠাৎ? উনি দেখলাম সদর্পে উত্তর দিলেন "আমার ভাড়া ছিল তো, নেহাত তোমার তাড়া ছিল, তাই এলাম, কিছু বেশি তো লাগবেই"।

রিকসা সম্পর্কে জ্ঞানের বৃত্তের যে অপরিসীম ব্যাসার্ধের কথা আমি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বড়াই করে নিজেকে বলে থাকি, তার অনেকখানি অংশের অংশীদার হতে গিয়ে আমার যে হাঁড়ির হাল হয়েছিল, সেকথা অবশ্য বলাই বাহুল্য। তবে রিকসায় যে রিক্স নেই, এই ধারণার সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ হিসাবে এক লোমহর্ষক কাহিনী আমার স্মৃতিতে চিরভাস্বর। উত্তর কলকাতার শহরতলীর বরানগর নামক যে এলাকায় আমি ছোট থেকেই বিচরণ করে এসেছি, সেই অঞ্চলের অনতিদূরে বেহালাপাড়া নামক একখানা বেহাল জায়গা আছে। একদা এক শরতের বিকেলে, আমি একটা রিকসায় গদীয়ান হয়ে বেহালাপাড়ায় নব্যপ্রতিষ্ঠিত একটি তেলেভাজার দোকানের সরেজমিন তদারকে যাচ্ছিলাম। তাদের আলুর চপে নুন ঠিকমত পড়ল কি না, বেগুনীটা ঠিক মুচমুচে হল কি না, সেই ব্যাপারেই একটা আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ করতে যাওয়া আর কি! দেরী হয়ে গেলে আবার লাইন হয়ে যাবে, কি জানি আলুর চপে নুন কম বলার আগেই হয়তো কতিপয় লোকজন সেটা খেয়ে ফেলবে, সামাজিক কর্তব্যে বিচ্যুতি ঘটে যাবে – এইসব অনেক ভাবনা ছিল। সুতরাং একটু তাড়া থাকায়, আর ট্যাঁকে ভাড়া দেওয়ার মত রেস্ত থাকায়, রিকসার বেহেস্তের অমোঘ হাতছানিকে সানন্দে অভিবাদন জানিয়ে সেদিন বেরিয়ে পড়েছিলাম।

রিকসায় যাঁরা সফর করেছেন, সকলেই জানেন, রিকসাওয়ালারা সাধারণত সাধারণ পথ পছন্দ করেন না। "বিপজ্জনক" ঘোষণা হওয়া দুটি বাড়ির মাঝখান দিয়ে, পরিত্যক্ত কাঠগোলার পাশ দিয়ে, প্রাচীন ব্রিটিশ আমলের জঙ্গল হয়ে যাওয়া ভূতুড়ে কারখানার পিছন দিয়ে সর্পিল সমস্ত গতিপথে তাঁরা নির্ভয়ে এগিয়ে যেতে থাকেন। যেতে যেতে পথে দেরী হওয়ার আগেই হঠাৎ দেখা যায় আশ্চর্য মন্ত্রবলে আপনার গন্তব্য, আপনার সামনে দণ্ডায়মান। কিন্তু এইদিন দৈবের কি পরিহাসে জানিনা, এইরকম দুরূহ কর্তব্য নিয়ে একখানি রিকসায় সওয়ার হয়েছি, প্রখর রোদে মাথায় ছাউনি পাওয়ায় খুব ফুর্তি হয়েছে প্রাণে। কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে, রাস্তার কতিপয় বখাটে বাইকের পরোয়া না করে সেই রিকসা চলতে লাগল শ্লথ বেগে, সর্পিল রাস্তার আবেগের বিন্দুল তোয়াক্কা না করে, বিপুল দক্ষতার সাথে, বড় রাস্তা – ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড - ধরে।

বেহালাপাড়া যেতে গেলে সেই বড় রাস্তা ধরে যেতে যেতে আই.এস.আই. (হ্যাঁ যেখানে সবাই অঙ্ক করে, ওইটা, বোমা বাঁধে না, কড়াই খুন্তিতে ছাপ মারে না) এর কিছু আগে একটা সরু রাস্তা দিয়ে বামপন্থী হতে হয়। কিন্তু আমার রিকসাচালকের বামদিকের গলিপথে আদৌ কোনো উৎসাহ আছে বলে মনে হল না। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ভাবাবেগের মতই বামপন্থাকে কচুকাটা করে, এবারে রিকসা আই.এস.আই. এর সামনে। এদিকে রিকসাচালক নির্বিকার হয়ে আনমনে প্যাডেল করে যাচ্ছেন। জীবনের প্রতি এমন উদাসীন থেকে নিজের কাজের প্রতি এমন একাগ্র মনোযোগ বোধকরি আমাদের ডাকসাইটে ফার্স্ট বয়েরও ছিল না।

কিন্তু এবারে যাত্রা পন্ড হয় এই ভয়ে দুরুদুরু বক্ষে বললাম, “দাদা আপনি ঠিক কোথা থেকে বাঁদিক নেবেন?” বাঁদিকে তখন আই.এস.আই.-এর বিশাল ফটক। দেখলাম আমার কথার আকস্মিক ফলস্বরূপ রিকসাটা মন্ত্রমুগ্ধের মত ঢুকে গেল সেই ফটক দিয়েই, কিছু দারোয়ান গোছের ভদ্রলোক পাহারায় ছিলেন, তাঁরা হাঁ করে রইলেন, বাধা দেওয়ার চেষ্টাও করলেন না। হয়তো এরকম অভাবনীয় ঘটনার আকস্মিকতায় তাঁরা বাকশক্তি বা চলৎশক্তি রহিত হয়ে পড়েছিলেন। শেষমেষ আই.এস.আই. এর ভেতর কিছুদূর গিয়ে আমার কপিধ্বজ থামল, মানে থামতেই হল তাকে, কারণ অগ্রসর হওয়ার মত সুপ্রশস্ত রাস্তা তার ছিল না। এর মধ্যে সেই ফটক রক্ষাকারীর দল প্রাথমিক বিস্ময়টা কাটিয়ে এসেছেন ঘটনাটার তদন্ত করতে, কি কেন ইত্যাদি। আমি বেশ দেখলাম তাঁদের “এই তোমার আক্কেল নেই, এখানে রিকসা নিয়ে এসেছ? যাবে টা কোথায় শুনি?” প্রশ্নের উত্তরে রিকসাওয়ালার করুণ আবেগঘন কণ্ঠে আর একটা প্রশ্ন বেরিয়ে এল, “আচ্ছা এটা কোথায় এলাম বলুন তো?!” আন্দাজ করলাম উনি হয়তো জলপুলিশের আন্ডারে; রিকসা চড়ার স্বর্গসুখ ছেড়ে হাহাকার করতে করতে পদব্রজে বাকিটা পথ পাড়ি দেওয়ার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিলাম। তদুপরি ঘটনার দুরূহ প্যাঁচের মাঝে আমার পকেটের রিকসাভাড়াটা যে সন্তর্পণে আত্মরক্ষা করতে চলেছে, তার আনন্দে রিকসাচ্যুত হওয়ার দুঃখে মলম লাগিয়ে নিলাম।

বেশ মন দিয়ে হাঁটছি, এমন সময় দেখি পিছনে সেই আত্মভোলা রিকসাচালক আসছেন, তাঁর দাবি, “আরে দাদা যাচ্ছেন কোথায়? আমার তো আপনাকে পৌঁছনো হল না, আসুন দাদা, বসুন।” ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু আমার অন্তরাত্মা এইরূপ ভালোমানুষির আড়ালে অতিরিক্ত ভাড়ার ফাঁদে পড়ে পকেটের মর্মান্তিক পরিণতি সম্পর্কে সজাগ; কিন্তু নাছোড়বান্দা লোকটা। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তুলিয়ে ছাড়লে, উঠলাম ভয়ে ভয়ে, কি জানি রাস্তার লোকে কি ভাববে। চললাম রিকসা চেপে, একসময় অতঃপর আবির্ভূত হলাম নির্দিষ্ট জায়গায়। ভাবছি মনে মনে, এইবার পঞ্চাশটাকা চাইলেই গেছি। আমার সব সম্বল নিমেষে গলে যাবে, ফুলুরি খাওয়া আর হবে না! নামলাম সসংকোচে, পকেটের চামড়ার বটুয়াটা বার করে শক্ত করে চেপে ধরলাম, কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে, “কত দেব দাদা” প্রশ্নবাণ নিক্ষেপের আগেই, “আচ্ছা দাদা, চলি তাহলে, ভালো থাকবেন” বলে রিকসা নিয়ে অন্তর্হিত হলেন তিনি, গলির বাঁক ঘুরে উধাও হলেন নিমেষে। নিখরচায় এমন একখানা রোম্যান্টিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হল। এরপর কি রিকসার গুণ না গেয়ে পারি? বলুন?

পুনশ্চঃ নামটা শিব্রামবাবুর থেকে ধার নিলাম, এর চেয়ে যুতসই নাম আর মনে এল না, তাই।

Written by **Rohit**

Photo by **Udita Chaudhury**

Biriyani

The hazy, grey lights of the city reflected on the dirty water of the pond. It was generous to call it a pond – the water had turned into a sludge, the surface of the pond almost entirely covered with refuse, some of the indeterminate, rotting things in deflated dirty plastic bags. Monte tried to see if breathing through the mouth will make it easier to tolerate the smell, but it didn't. He looked at the peacefully sleeping Amol beside him and wondered how he could sleep through the oppressive smell. Well, Amol was one of those people who could sleep through anything, probably even something like a loudspeaker blaring by his side. Monte looked up at the old man squatting beside the tarpaulin shack they were in, smoking his biri and looking up at the hazy night sky, fouling up the air even more. As someone who was dirt poor and never really had anything of worth, jealousy wasn't one of the emotions Monte ever entertained, lest it became overwhelming, but he couldn't help but feel a tinge of jealousy at Amol's ability to sleep through anything.

Monte and Amol came to Kolkata from a small village near Birshibpur. Monte's father was a rickshaw-puller who would come home drunk every night like clockwork and beat up his mum to take out his frustrations of a life unfulfilled. He'd always be a changed man in the morning, bright eyed and bushy tailed, talking to Monte as if last night was all normal. His mom wasn't much better either – other than the bare-minimum housework she didn't do much else, except staining her teeth with the paan she was constantly chewing, and staying glued to their old, black-and-white TV for every spare moment she had. Monte would be left all alone to his own devices, skipping classes at the village school, and running around causing general mischief around the village. Amol's situation was a little bit better – even though he was born with a congenital deformity where his right hand was nothing more than a stump, he had a mother who cared about him. She went to Birshibpur everyday to clean the homes of a few rich people in the city. He didn't know much about his dad, except his mother saying, "Think as if you do not have a dad, think of him as dead" whenever the topic of his missing dad came up. Well, he didn't miss his dad much because his mom really took good care of him and made sure he went

to school and did his homework. But despite all that, Amol would be a big troublemaker – much more than Monte. From stealing mangoes from the trees in someone's yard to more serious crimes like cutting off the tails of the village stray dogs – if there was trouble in the village you be reasonably certain that Amol had something to do with it. In the beginning, he used to use his deformity to gain leniency from the teachers and the people in the village, but they soon wizened up to his tricks and gave him no leash. Monte and Amol were friends, with Monte mostly playing the role of the more mature of the duo, trying to get Amol out of trouble and disabusing him out of his most outrageous troublemaking ideas. Monte had always thought if one of his parents cared about him like Amol's mother did, he probably would have been one of the 'good' kids who stayed in class and faithfully did the things they were told to. But Amol had a mind of his own, and being a good kid was the last thing on that mind.

It was Amol who had the brilliant idea of going to Kolkata during the Durga Puja. They had skipped school and were sitting in the shade of a big Banyan tree on the side of a big field on the edge of the village – lazily eating from their cache of freshly stolen mangoes and guavas. The banyan tree had its big thick aerial roots reaching out to the ground like hands trying to balance itself. There was only the sound of the wind and the two boys chewing on their fruit, looking out at the field – the vast expanse only punctuated by a kid herding a few goats in the far distance. The wind was making slow waves in the thick grass as it blew around the field. This idyllic silence was broken by Amol.

"What if we went to Kolkata during this year's Puja?"

"What? Where did that come from?", asked Monte.

"You know, so many people from all over the place go to Kolkata for the Puja. And they are especially loose with their money during that time. We can make a lot of money just by begging for it. We will come back home rich, and you can finally buy that cycle you've had your eye on."

Monte's neighbour, Mr. Samaddar, had recently bought a new bicycle and he was looking to get rid of his old one for cheap. He had asked his dad for money to buy it on a morning where he looked more cheerful than usual, but he was turned down. As a family who was barely making their ends meet, he had expected as much.

"Just begging, or are you thinking of stealing and pickpocketing too? Because, you know, if the police catches us, we will be in serious trouble", Monte asked.

"You know I don't do that. My mom has made me promise that I'm never going to steal or rob, and I'm not going to break her heart", said Amol.

Monte smiled and thought, "At least he has some morals." But he still needed to try to dissuade Amol from this.

"What about our parents?" asked Monte as a last-ditch effort.

"I can make something up and persuade her. She trusts me. As for your parents, I don't think they'll even realise you are gone for a few days", said Amol.

"Hmm. That's probably true. But I still don't like this one bit. There are so many things we don't know!"

"C'mon, Monte. Let's do this! We will get to see the sights in the city, we might even be able to buy some rich people food with the money we make! Plus, I am friends with our local ticket collector's son, so he'll let us ride the train from here to Kolkata for free!"

"Well, okay. I'll come.", Monty relented. "But only because I want to keep you out of trouble", said Monte, even though he was secretly excited about their trip.

"Deal!", said Amol, grinning through his teeth.

The journey on the train was uneventful enough. Amol wanted to spend the little amount of money they had saved for their return ticket on snacks, but Monte was able to dissuade him from it. What they had wasn't even enough for the tickets, but they were hoping that they'd make enough money in the city to cover it.

"With my stump of a hand and my doe eyes, we will make more than what we need and then some", winked Amol, to a sigh and an eyeroll from Monte.

They got off at the Howrah station when it was pitch-dark at night. Monte was surprised at the sea of people still moving about after midnight. They needed a place to sleep for the night – they had brought a couple of shawls along with them to keep warm. In their village, it was easy to find a tree to sleep under as long as you are warm enough, but it was hard to find something like that here in the city. They finally found a park after walking quite a lot from the train station, and tried to sleep on a bench amidst the cacophony of noises from the city.

Monte was awakened by someone shouting and something cold touching his legs. A policeman had come up to them and was tapping his baton on their legs to wake them up, saying, "You can't sleep here!"

"So where can we sleep?", Monte asks.

"That's not my business, just don't sleep in the park. Now off you go!", shouted the policeman again, waving his baton.

Monte and Amol wrapped themselves in their shawls and started walking away from the park. The roads were more deserted now, the streetlights creating dim, conical silos of light amid the hazy darkness. And in that hazy darkness, Monte could make out darker shapes, sometimes moving, sometimes with sounds of coughing coming from them. They must have been in the poorer area of the town with the homeless people on the streets. Monte felt for the little bundle in his pants which had the bit of money they brought with them, but he realised with horror that it was not there anymore. He must have lost it at the station with all those people around them, or he might have been pickpocketed even on the train.

They had walked around for almost an hour, trying to find a place to sleep for the night – none of the homeless people would give them an inch of space – and they didn't dare spend the night on a completely deserted corner. It was around this time they encountered the old man – he was a dark shape sitting in the corner of the street, calling them and gesturing with his hand with a biri in it. As they approached him, they realised that he didn't have his other hand, just like Amol. The old man asked them what they are doing in the streets, and when he heard that they didn't have a place to sleep, he invited them to his shack near the stinky pond. It was a derelict shack, made of thin bamboo sticks and dirty tarpaulin. No wonder anyone else comes here, Monte thought, as he tried to focus his thoughts through the overwhelming stink. When Monte asked the old man his name, he said he didn't have a name and they can just call him "Dadu". Dadu had lost his left hand as a kid in an accident when he was trying to cross a train line. Monte thought, maybe that's why he beckoned them – maybe Amol reminded him of himself. They were grateful when Dadu gave them a half-eaten pack of Parle-G biscuits, and gave them a corner of the shack to sleep in.

The morning sun seemed to rear up its dim head bashfully and tried its best to shine through the thick smog. Dadu was a beggar who had a spot on a busy street in Howrah. The boys decided to go with him for the day and get some money for the bus fare to travel to the Kolkata proper. They didn't have any food left, but Dadu promised them they'll have enough to eat something by midday.

It was a good spot. A lot of people walked that road towards the train station. There was also a busy bus stop right before that spot which unloaded a lot of passengers. But the best part about the spot was an eatery right across the street called "Ravi's Biriyani Point". Every time its doors opened, the warm, spice-laden smell of Mughlai biriyani would waft across the street and make their mouths water. The boys were hungry enough already, but the aroma made their empty stomachs grumble.

By midday they had enough money to buy themselves a lunch of a few chappatis and gravy with indeterminate vegetables floating in it from a roadside stall. Even though it wasn't the best, it was the first warm food they ate after coming to the city, so they relished it. Dadu sat and smiled, looking at the two kids eating with gusto.

Right after they came back to their spot, tragedy struck. A little girl ran out onto the street after getting off the bus, before her mom could corral her. They were closer to her, and Dadu ran after her. Before he could get to her, a bus came and struck him. Monte and Amol watched in horror and Dadu got flung off the bus onto the side of the street and his head struck the edge of the sidewalk with a loud crunch. By the time Monte and Amol got to him, he was already surrounded by people. His head had burst open, with chunks of blood and grey matter everywhere.

The next hour was a nightmarish blur. The police arrived with their sirens and lights. Dadu was pronounced dead. Everyone was questioned, including Amol and Monte. The police were reasonably satisfied with this being an accidental death. They left the body with Amol and Monte as they were the only next of kin for Dadu. They went back to the shack and fetched an old, yellowed photo of a younger Dadu, and someone gave them an incense stick. They set up the photo and burned the incense stick, and put down a stretched towel so that people could donate for his cremation. And people did donate generously. The crowd who had stuck around after the accident was mostly still there, and many of them were donating. By the end of the night, they had enough to cremate Dadu.

While they were carrying Dadu's body to the ghats for cremation, Amol said, "What if we just bury his body beside the pond? No one will be any wiser."

"Where is this coming from? This is blasphemous!", exclaimed Monte.

"No, think about it", said Amol, "The pond stinks enough already that if the body emitted any smell, it'll be undetectable."

"I will not go along with this idea. This is stealing. Didn't you say you wouldn't disappoint your mom?"

"Yes, I did say that. But this is not really stealing. People gave the money for Dadu. And I'm sure the old man would not want us to waste the money uselessly, and instead would want us to have some of that biriyani we have been smelling all day. Don't you think so?"

“I don’t think you can speak for the dead, but I think your words have some merit. I am awfully hungry.”

“Okay, let’s bury the body then. We will respect Dadu by not wasting money, and having his favourite boys eat their fill”, said Amol again, in case Monte needed more convincing.

They carried the body to the shack illuminated only by the dim light of the moon; the shack was a bit removed from civilisation and the bustle of the streets and did not have any streetlights nearby. Even though Dadu looked frail, he was surprisingly heavy to carry. They had to stop to rest a couple of times before they made it to the shack. They conveniently found a spade in the shack- the shack was surprisingly well stocked with eclectic items, although most of them were knick-knacks. While looking through things, they found pencil batteries, a torch, a wide assortment of ropes, hammers and so on. Monte wondered why Dadu had collected these things. Some of them, he thought, could have easily sold for some money.

They found a spot beside the shack and started digging a grave. It was a surprising amount of work, digging a man-sized grave. When Monte got tired, Amol would help dig, although he didn’t make much progress with his one hand. Eventually they finished digging it, and gingerly lowered Dadu into his grave. They joined they palms and finished saying a silent prayer, and then shoveled the dirt onto Dadu. By the time they had finished burying all the dirt back into the grave, they were tired and dirty. They used water from a mineral water bottle they had bought to clean themselves.

“Let’s go get some food then,” said Amol. “I don’t know about you, but I’m hungrier than I have ever been. I could really eat some of that biriyani right now.”

“Sounds like a good idea. Let’s go!”. Monte was hungry too.

The proprietor of the Ravi’s Biriyani Point was a nasty man. As soon as they had opened the door to the restaurant, he was on them.

“Out! This is not really a spot for beggars!”, he shouted at them.

“But we are not here to beg. We have money, we will pay for food.”, Monte said.

“I don’t believe you. Just get out of here before I throw you out. It’s the time of the Durga Puja, I don’t really want to beat up kids.”

“No, we really have money, just you wait.”, said Monte, while fishing out the wad of notes they had collected for cremating Dadu.

“We will pay extra if you let us eat here.”, said Amol, to sweeten the deal.

The sight of money seemed to soften the stance of the proprietor a bit. “You guys can go sit in the corner over there.”, he said, pointing to a dark corner of the restaurant, away from the regular customers.

“Next time, take a shower and clean yourself up before coming to a restaurant. You will drive away my regular customers with your stink and filth.”

Monte hadn’t even realised how dirty they had become, especially after digging the grave.

“Now, what do you guys want?”

“We want two plates of your finest biriyani!”, said Amol proudly.

“Chicken or mutton?”

“Whichever is more expensive. Today we eat like kings.”, said Amol, winking at Monte.

The proprietor rolled his eyes. “Okay, coming right up. Just make sure you don’t disturb my customers.”

They saw him go into the back of the kitchen, fetch two plates and put heaping portions of biriyani onto them. Their stomachs rumbled with anticipation.

He brought the plates and some raita to their table. “Here’s two garma-garam mutton biriyanis. And I heaped the plated because you boys looked hungry. Enjoy.”, he said with a smile.

The boys couldn’t believe their eyes. The glorious food they had been smelling all day was finally in front of them. They dug in, barely bothering to chew their food before gulping it down. The biriyani was delicious. It was well-spiced, the flavour of the cardamom, cinnamon and cumin coming through just right, with the occasional bit of fried onions, sumptuous pieces of spiced mutton, and the orange-white rice so soft and fluffy. The boys were silent except for the sounds of chewing, their enjoyment palpable in the air.

They had almost finished half of their plates when Monte heard a gagging “Huuk!” from Amol.

“That piece of mutton had a weird texture, almost like a piece of Dadu’s brain”

“What are you even talki-”

Before Monte could finish, Amol started hurling all over the table. Chunks of half-digested mutton, gluey-rice and bile, all mixed together for a horrible smell and effect. Monte tried to hold Amol and make him stop puking, but it wasn’t working. It didn’t take long before the smell and the situation got to him and he started puking too.

The proprietor held them by their collars and kicked them out, saying “It was my mistake letting you guys in. Beggars like you cannot digest food like this!”

While they were retching and puking on the sidewalk, Monte was thinking that all the good biriyani they had eaten were all coming out. He could even smell a bit of the chappati and soup they had eaten in the morning, but it was probably just his imagination. After a particularly horrible fit of retching, Amol, his eyes bloodshot, puke drooling from the side of his mouth, looked at Monte and said, “Maybe we should have cremated the old man after all.”

Written by **Soumik Ghosh**

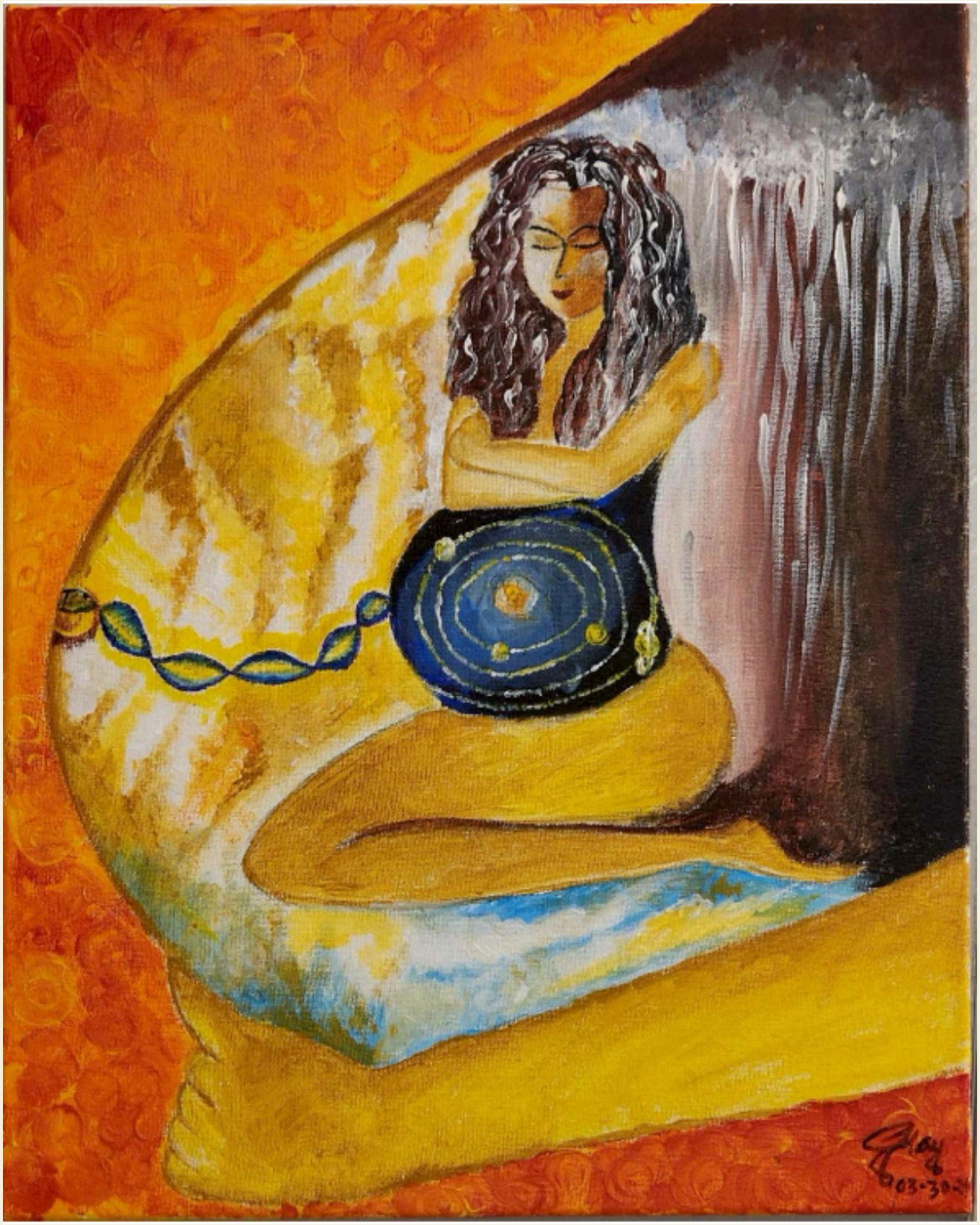

Art by **Gargi Bandyopadhyay**

কে,কে এসেছিল?

---আচ্ছা ,বাবু যেন কবে কলকাতায় আসবে ? প্রশ্ন করলেন 70 বছরের অনিল বাবু ।
--এ মাসের শেষে । বলে ওঠেন অনিলবাবুর স্ত্রী অনু ।
--তখনই না হয়, ওষুধটা এনো অনু ।
---কি যে বল ,ওটা তোমাকে ডাক্তারবাবু রোজ খেতে বলেছেন । তোমার প্রেসার এত হাই ।
---কিন্তু এত বৃষ্টিতে । আবারও বললেন প্রৌঢ় অনিল বাবু ।

---সেটাই তো মুশকিল । আমি তো ওষুধের দোকানের রবিকে ফোন করেছিলাম। বলল যে , রবিই দোকানে আসতে পারছে না । কলকাতায় বন্যা। চারিদিকে জল আর জল। এর মধ্যে ওষুধ সাপ্লাই হবে কি করে? খুবই চিন্তিত স্বরে বললেন অনু মানে অনিমাদেবী ।

অনিল বাবুর স্ত্রী এবং বাবুর মা ।

নৈহাটি শহর ।

গঙ্গা ধারে বিশাল রায়চৌধুরীদের বাড়ি। মনে পড়ে, সেই কবে কুড়ি বছরের বধূ হয়ে আগমন।
তখন বাড়ি ছিল সরগরম । কত মানুষ ।
কত হইচই।
দালানে দুর্গাপুজো । কালীপুজো । কতকিছু।

কিন্তু আজ ইতিহাস ।
ধীরে ধীরে কালের নিয়মানুযায়ী প্রবীণ ব্যক্তিরা অমৃতলোক যাত্রা করেছেন । সেই দিনের কিশোরীরা আজ প্রৌঢ়া।
আর তাদের সন্তানরাও অধিকাংশই বাইরে প্রতিষ্ঠিত।

এই যেমন অনু ও অনিল বাবুর একমাত্র ছেলে বাবু মানে দেবপ্রিয়।

বোম্বের মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির পদস্থ অফিসার।
তার স্ত্রী রঞ্জনা ও ওখানকার একটা কলেজের ইংলিশের প্রফেসর।

অনেকবার করে ওদের কাছে ডাকে ।
গেছেন ও কয়েকবার বোম্বে ।

কিন্তু মন বসে না । একমাস পরেই মনে হয় নৈহাটি হাতছানি দিচ্ছে ।
কতদিন গঙ্গা দেখেননি ।
মন বড় চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত হয় ।

তাছাড়া এখানে একটা প্রবীনদের গ্রুপ আছে।
পাড়ার মিন্টু। ট্রাভেল এজেন্সি খোলার পরে সংঘাতিক আনন্দ ।

দীঘা, মন্দারমনি, বর্ধমান রাজবাড়ী, বাওয়ালি রাজবাড়ি। আরো না জানি কত ঘুরে এসেছেন, তা বলার নয় ।

কিন্তু দুমাস আগে ।
ভদ্র বাবুর ঘুমের মধ্যে চলে যাওয়া।
তার স্ত্রী মিতা । একমাত্র মেয়ে রানীর কাছে দিল্লিতে চলে যাওয়ায়। গ্রুপটা ভেঙে গিয়েছে ।

দত্তবাবুরাও ছেলের কাছে ছয় মাসের জন্য US এ তে চলে গেলেন।

বড় একলা হয়ে গেছেন এই রায়চৌধুরী দম্পতি।

বাড়ির ওই দিকে আরেক শরিকি ও তাদের একমাত্র মেয়ে পিউ থাকে।
কলেজে পড়ে । বলা চলে পিউই সব দেখভাল করে। খোঁজখবর নেয়।

এদিকে প্রমোটারের অনেক দিনের ইচ্ছে।
এই চৌধুরী বাড়ি ভেঙে একটা শপিং কমপ্লেক্স খোলে।
সবার মত ছিল না ।
এখন বাহুবলে ও অর্থবলের অভাব।

প্রোমোটারের স্বপ্ন বাস্তব হতে চলেছে।

বাবুর কাছে পাকাপাকি থাকবেন স্থির হয়েছে । বাবু এসে বাকিদের সাথে কথা বলে ডেট ফাইনাল করবে।
এবছরের পুজো ও হবে না ।
কেউ আসবেও না ।
তাই মনটাও ভারাক্রান্ত ।

কিন্তু বাধ সেধেছে ভাদ্র মাসে এমন অকাল বর্ষণ।পুরো পশ্চিমবঙ্গে ভেসে যাচ্ছে। তারপরে ওষুধের আকাল ।

অনিমা সত্যিই ভীত।
বারবার ঈশ্বরকে ডাকছেন। বৃষ্টি কম করো। সব আগের মতন করে দাও ।
ওষুধও কালকে শেষ হয়ে গেছে ।
কি যে হবে?
ভাবতে পারছেন না অনিমাদেবী।

এরমধ্যে আবার পাওয়ার চলে গেল।
হঠাৎ করে আঁধার নেমে এলো। পাওয়ার কাট একদমই হয় না ।
তাই মোমবাতির প্রয়োজনও হয়না।
বাড়িতে ও নেই ।
ঠাকুর ঘর থেকে প্রদীপটাই নিয়ে আসলেন। বসার ঘরে সেন্টার টেবিলের ওপর
রাখলেন,অনিমা দেবী ।

এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ।

দরজা খুলে দেখলেন সামনে একটি অল্প বয়সী মেয়ে ।
হেসে বলল -এটা কি অনিল রায়চৌধুরীর বাড়ি?
-- হ্যাঁ মা। তুমি কে?
-- আমি গৌরী। এই নিন অসুধটা।
অসুধর প্যাকেটটা দেখে উৎফুল্লিত অনিমা।
বললে --ও রবি ওষুধ পাঠিয়ে দিয়েছে?
ভেতরে এসো মা ,বাইরে অন্ধকার।

প্রদীপের আলোর দেখলেন গৌরীকে ।
কি স্নিগ্ধ সুন্দর মুখশ্রী !
মনটা ভরে গেল ।

খুব খুশি হলেন ।
গৌরীকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বললে - তুমি পিউয়ের বন্ধু না ? দেখেছি মনে হচ্ছে তোমাকে। খুব চেনা চেনা মুখ ।

গৌরী বড় বড় চোখ তুলে খালি হাসে।

--আমি আসি ,বলে চলে গেল গৌরী।
অনিমা প্রদীপের আলো দেখালেন।

অসুধ পেয়ে খুশি অনু বললে -জানো, রবি ওষুধটা পাঠিয়ে দিয়েছে।

অনিল বাবু চেয়ারে বসে ।
মুখে আঙ্গুল দিয়ে চুপ করতে বললেন। তারপর বড় বড় ঘ্রাণ নিয়ে বললেন -- শিউলি ফুলের গন্ধ পাচ্ছো অনু?
অনু ও তখন বড় বড় শ্বাস নিতে না বলে---
- হ্যাঁ তাইতো । আগের বছরে ফুল ফোটেনি গাছটাতে ।
কত বছরের পুরনো গাছ!
এবার এত ফুল ফুটেছে !
ঘর পর্যন্ত তার গন্ধে সুরভিত !আশ্চর্য ! চোখে পড়েনি তো। এত কুঁড়ি এসেছে গাছটাতে।
দুদিন পর।
সোনা রোদে ঝলমল শহর।
পুজো পুজো গন্ধ ।

সকাল বেলায় চা খাচ্ছিলেন রায়চৌধুরী দম্পতি।
দরজায় করাঘাত ।
রবির হাতে ওষুধের প্যাকেট ।
অনুর কথা শুনে অবাক ।
না কাউকে দিয়ে তো রবি ওষুধ পাঠায়নি।

অনু অবাক হলেও হেসে ওষুধের প্যাকেট নিয়ে দাম দিয়ে দিলেন।
ছুটে গেলেন শরীকের ঘরে ।
পিউকে দেখে অনিমা দেবী বললে-- বৃহস্পতিবার তোর কাছে তোর বন্ধু গৌরী এসেছিল।
অবাক পিউ।
এই নামে তো কোনো বন্ধুই নেই জেঠিমা। তুমি ভুল করছ।

অনু শিহরিত।
তবে কে এসেছিল তার ঘরে?
প্রদীপ জ্বালিয়ে ,কাকে আমন্ত্রণ করেছিলেন ?

--কোথায় থাকো জিজ্ঞেস করাতে বলেছিল '
_পাহাড়ে
অনু বলেছিল _ও দার্জিলিংয়ে?? তুমি সৌভাগ্যবতী! রোজ কাঞ্চনজঙ্ঘা দ্যাখো ।কি তার শোভা !

তারপর থেকেই তাদের মরা শিউলি গাছে ফুলের বন্যা।
শেফালী ফুল আর পূজার রোদে মায়ের বোধন হয়ে গেছে।

অনু গৌরীকে দেখেছেন সমস্ত দেবী মূর্তিতে।
তাই এত চেনা ।
তাই এত আপন।

অনু কখন যেন অজান্তেই জমিদার বাড়ির গিন্নিমা হয়ে উঠেলেন।
সদর্পে ঘোষণা করলেন এবারও ঠাকুরদালানে দুর্গাপুজো হবে।
স্বয়ং দেবীর আদেশ।
ঠাকুরদালান ও জমিদার বাড়ির এই অংশ বিক্রি হবে না।
তারপর ইতিহাস।
তিনশো বছরের পূজা এখনো চলছে।

Written by **সুপর্ণা বসু দে**
Art **ঋজু নাগ**

Photo by **Saptarshi Bagchi**

Photo by **Sampurno Sarkar**

দুর্গাকথা

মা দেবী মা যার প্রতীক্ষায় আপামর দেশবাসী আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে একটি বছর আজ তার কিছু কথা শোনাব। ঠিক কবে থেকে এই পূজার শুরু?

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দুর্গোৎসব আসলে অতি প্রাচীন একটি অনুষ্ঠান। তামসী পূজায় এই উৎসবের সূত্রপাত আর সাত্ত্বিকী পূজায় এর পরিণতি। একদিকে শারদোৎসব আর অন্যদিকে দেবীমাহাত্যের প্রচার। চার হাজার বছর আগে এশিয়া মাইনর এবং ক্রীট দ্বীপ এ জগন্মাতার পূজার প্রচলন ছিল। আর তারও এক হাজার বছর আগে সুমেরু প্রদেশে 'নিন খুসার্গ' অর্থাৎ 'পার্বতী' মাতার পূজার প্রচলন দেখা গেছে।

তবে মহিষমর্দিনী দেবী দুর্গার আরাধনা পঞ্চম শতাব্দীর বেশি প্রাচীন নয়। মার্কন্ডেয় পুরানে বর্ণিত,সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য সর্বসান্ত হলে মেধস ঋষির কাছে দেবী মাহাত্ম শুনে দেবীর মৃন্ময়ী মূর্তি তৈরি করে নিজহস্তে পূজা করেন। আরো বর্ণিত আছে যে,পরপর তিন বছর নিজের দেহের রক্ত দিয়ে সেই পূজা সম্পন্ন করেন দুজনেই। দেবী মা প্রসন্ন হয়ে বর প্রদান করেন। তাই মা দুর্গার পূজা একবার করলে পরপর তিনবার করার রীতি প্রচলিত আছে।

আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের যে দুর্গাপূজা ,তা অকালবোধন নামে পরিচিত। রাম রাবনকে বধ করার জন্য মহাদেবী মা দুর্গাকে জাগরিত করেছিলেন। পুরানে কথিত আছে যে, রাবন বসন্তকালে চৈত্র মাসে দেবী পার্বতীকে পূজা করে সন্তুষ্ট করলে দেবী তাকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন ফলে রামের সকল আঘাত বিফল হয়ে যায়। রাবনের ঔদ্ধত্য উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেই অবস্থায় রাম ব্রহ্মার দারস্থ হয়ে রাবন বধের উপায় জানতে চাইলে Bramha রামকে দেবী দুর্গার আরাধনা করার পরামর্শ প্রদান করেন। রাম ১০৮ টা পদ্মফুল সহকারে আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে দেবী দুর্গার আরাধনা করে বর প্রাপ্তি লাভ করে।এই আশ্বিন মাসের দুর্গার যে আরাধনা করা হয় তা 'অকালবোধন' নামে পরিচিত,অসময়ে মা দুর্গাকে জাগরিত করেছিলেন রাম এবং রাবন বধ করার পর মহাসমারোহে বিজয়ার উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রাম সীতা লক্ষণ অযোধ্যার রাজ প্রাসাদে ফিরে এলে সমগ্র অযোধ্যা আলোর সাগরে ভেসে ওঠে। আজ দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন নিশ্চিত করতে যুগযুগ ধরে মা দুর্গার আরাধনা করার জন্য সমগ্র জগৎবাসী অধীর অপেক্ষায় প্রহর গুনে।

ইয়া দেবী সর্বভূতেষু শান্তি রূপেণ সংস্থিতা....

Written by **বর্ণালী চৌধুরী**

I AM ALIVE

I see river flows , grass gently shivering in the breeze
The sky is ready ; enough it says holding the clouds
Its drizzling everywhere.
I am getting into it, I see it all, I breathe. I am alive
The wet soil , muddy water , seen a nearby spring
Insects are loving it & the nature as well
Trees are happier today , all wet , watering its soul
I am getting into it..I see it all, I breathe. I am alive
It is pouring & pouring , creating a lullaby for the nature
I have the power & majesty of nature on my side
I am getting into it, I see it all, I breathe. I am alive!

Written by **Sandeep Mukherjee**

Art by **Vaishnavi Singh**

যদি এমন টা হতো

কই রে, কোথায় গেলি সব? শাঁখ টা নিয়ে যায়, উলু দে, বর এসে গেছে - বলতে বলতে দৌড় দিল একদল ঝলমলে শাড়ি পরিহিতা মহিলার দল। কারো কারো পরনে আবার সালোয়ার কামিজ।

খানিক বাদে চওড়া লাল পেড়ে শাড়ি পরে এক মাথা ঘোমটা টেনে হাসি মুখে বরণডালা হাতে এগিয়ে আসতে দেখা গেল কনের মা কে- জামাই বরণের আনন্দ তার চোখে মুখে ঝরে পড়েছে ক্রমশ জামাই বরণ করে মিষ্টি খাইয়ে ভিতরে নিয়ে যাওয়া হল। চারিদিকে সানাই এর সুরে মাতোয়ারা।

গোধূলি লগ্নে বিয়ে। সিমন্তিনী ওরফে তিথি কনের সাজে অপেক্ষা করে আছে সেই শুভ মুহূর্তের জন্য। হঠাৎ-ই 'বর এসেছে, বর এসেছে- শুনে লজ্জায় মাথা নীচু করে রইল।

ছাদনাতলা প্রস্তুত। বর এসে দাঁড়িয়েছে ঠিক মধ্যিখানে। তিথি কে পিঁড়িতে বসিয়ে এদিকে-ই নিয়ে আসছে তিথির দাদা, ভাই, জামাইবাবুরা।বরের চারপাশে সাত পাক ঘোরা শেষ হতেই সবে চোখ থেকে পানপাতাটা সরাতে যাবে -এমন সময়ে সেই গগনবিদারী চিৎকার। তারপরেই আচমকা কারোর মাথা পড়ে যাওয়ার মতো একটা বিকট আওয়াজ।

আওয়াজ টা এসেছিলো তিথির মাসতুতো বোন মৌ এর কাছ থেকে। ছোটবেলা থেকে মৌ এর খুব যাতায়াত এই বাড়িতে। মাঝখানে কিছু বছর কলকাতা তে না থাকায় যোগাযোগ অনেক তা কমে গেছে। তবু তিথিদির বিয়ে তে আসার আমন্ত্রণ টা ফেলতে পারেনি।অনেক দিন বাদে কলকাতায় এসেছে সে দিদির বিয়ে তে।

কিন্তু ঘটনাচক্রে তিথিদির বরের সঙ্গে আলাপটা তার হয়ে ওঠেনি। কিন্তু হঠাৎ এ বিয়ের আসরে তার এই 'না....' বলে চিৎকার করে ওঠাতে সবাই খুব স্তম্ভিত হয়ে যায়। তার পরক্ষনেই মৌ অজ্ঞান হয়ে যায়।একটু জ্ঞান ফিরতে সে একমনে বিড়বিড় করতে থাকে ' না না এ হতে পারে না, তিথিদির এতো বড়ো সর্বনাশ হতে পারে না, তোমরা সবাই আটকাও, বাঁচাও আমার দিদি কে', বলে আবার অজ্ঞান হয়ে যায়।কোনোরকম-এ চোখে মুখে জল দিয়ে একটু সুস্থ বোধ করতে তাকে সবাই মিলে একটা ফাঁকা ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। অতিথিরা বিভিন্ন রকম প্রশ্ন করতে লাগলো মৌ কে।

এমন সময় তিথির বাবা সমীরবাবু সেই ঘরে এলেন এবং কিছুক্ষনের জন্য টা খালি করে দিতে সবাই কে অনুরোধ জানালেন। সবাই বেরিয়ে গেলে মৌ এর পাশে এসে বসলেন। মৌ এর মাথায় হাত রেখে সমীরবাবু বলতে লাগলেন - 'মৌ মা, আমি তোমার বাবার মতো, তোমাকে সেই ছোট থেকে দেখছি। আমাকে তুমি সব খুলে বলতে পারো, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি।’মৌ তখন দুভাতে মুখ ঢেকে হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে। শুধু বলে -' মেসোমশাই, আগে বিয়ে টা আটকাতে হবে, তিথি দি কে এভাবে আগুনে ফেলে দেবেন না '।

সমীরবাবু মৌ এর পথে হাত রেখে মৌ কে আস্বস্ত করে বলেন -'আমি বিয়ে স্থগিত রেখেই তোমার কাছে এসেছি মা, তুমি আমায় সব তা খুলে বোলো, আমি তারপরেই যা সিদ্ধান্ত নেবার নেবো। আমার হাতে সময় কম, অতিথিরা অপেক্ষা করছেন, তবুও আমি তোমার সব কথা আগে শুনতে চাই' । মৌ সব ঘটনা খুলে বলতে থাকে তিথির বাবাকে।

আজ থেকে প্রায় বছর সাতেক আগের ঘটনা। মনে আছে মেসোমশাই, আমি কলকাতার এক নামী সকারী কলেজে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। আপনাদের সকলের আনন্দের সীমা ছিল না। কলেজে পড়াকালীন-ই আলাপ হয়েছিল একটা ছেলের সাথে। দেখতে শুনতে ভালো- মিশুকে স্বভাব, বন্ধুত্ব হতে সময় লাগেনি। আমারও তখন বয়স কম, প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু তখন এটা বুঝিনি যে আমি একটা মানুষের নয়, অমানুষের প্রেমে পড়েছি। বেশ ভালোই কাটছিলো মাস ছয়েক, হঠাৎ ই একদিন ঘটলো সেই ঘটনা টা।

তখন অগাস্ট মাস, আমাদের কলেজে তখন একটা সেমিনার চলছিল। সঙ্গে রুগীদের চাপ তো আছেই। আমার এক সিনিয়র দিদি প্রায় ৩৬ ঘন্টা টানা ডিউটি করে ওই সেমিনার রুম এর একপাশে শুয়ে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিল। সেদিন রাত্রে আমাদের সকলের একসাথে একটা পার্টি তে যাবার কথা ছিল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও দিদি টা না আসায় আমি খুঁজতে খুঁজতে গেছিলাম সেমিনার রুম এর সামনে।ভেতর থেকে একটা অদ্ভুত আওয়াজ পেয়ে দরজাটা খুলতে যাই, বন্ধ ছিল। অনেকবার দরজা ধাক্কানোর পর কোনো ভাবে খুলে যেতেই দেখলাম চার -পাঁচ জন ছেলে দৌড়ে পালালো। খুব আশ্চর্জজনকভাবে তার মধ্যে আমার সেই প্রেমিক কেও দেখলাম। আমার মুখোমুখি এসে যাওয়াতে শুধু একটা কথা ই বললো - ' তুই কিছু দেখিস ও নি , কিছু জানিস ও না'।আমি কিছুটা হতচকিত হয়ে গেলাম। মুহূর্তে ই সম্বিৎ ফিরতে ছুটে গেলাম সামনে দিদি টার দিকে, কিন্তু ততক্ষণ এ বোধয় সব শেষ। দিদির পরনে একটা সুতোও নেই, চারিদিকে আঘাতের চিহ্ন, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, চোখের কোন রক্ত, সে যে কি বীভৎস দৃশ্য বর্ণনা করা কঠিন। আমি ওখানে আর না থাকতে পেরে ছুটে বেরিয়ে এসে হরহর করে বমি করে ফেললাম।

বিশ্বাস করুন, তার পর থেকে প্রায় দশ- বারো দিন আমি ঘুমাতে পারিনি । আমার ওপর ক্রমশ হুমকি আসতে থাকে, মুখ খুললেই খুন হয়ে যাবো।শেষে এই প্রবল মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে মেডিকেল পড়াই ছেড়ে দিলাম । কলকাতা ছেড়ে জার্মানি চলে গেলাম। কোথাও গিয়ে যেন শান্তি পাচ্ছিলাম না। নিজেকে বড়ো অপরাধী লাগছিলো।

আজ এতো বছর পর কলকাতা তে এসে আবারও হঠাৎ ওই শয়তান কে দেখে মাথার ঠিক রাখতে পারিনি। শুধু তিথিদি কে বাঁচান, ও একটা জানোয়ার- মেরে ফেলবে আমার দিদিটাকে -এটা কখনো হতে পারেনা।' - এই পর্যন্ত এক নিঃশ্বাসে বলে একটু থামলো মেয়েটা।

সমীরবাবু মৌ এর দিকে এক গ্লাস জল এগিয়ে দিয়ে বললেন- ' ধন্যবাদ দিয়ে তোমায় আমি ছোট করবো না, আমার মেয়েটার জীবনটা বাঁচিয়ে দিলে'।

বিয়ের আসরে ফিরে গিয়ে সমীরবাবু গুরুগম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করলেন - ' শোনো তিথির মা, আমাদের মেয়ের বিয়ে এই ছেলের সাথে কখনো হতে পারেনা । আর আপনাদের সকলের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এই ভদ্রলোক এর মুখোশ পড়া ছেলেটি আসলে একটি ধর্ষক, একজন খুনি। আজ থেকে বছর সাতেক আগে কলকাতা তে ঘটে যাওয়া ঘটনার অপরাধী আপনাদের সামনে।একে একেবারেই ছেড়ে দেবেন না, এর চরম শাস্তি দরকার। প্রশাসন একে ছেড়ে দিলেও জনগণ ওকে শাস্তি দেবে। বর বাবাজি তখন পালাবার পথ পায় না। যে দিকেই যায়, একটাই স্বর - ' ও একটা ধর্ষক ,ও একটা খুনি, ধর্ষকের শাস্তি চাই, খুনির শাস্তি চাই'।প্রমাণের অভাবে সরকার অনেক সময় শাস্তি দিতে না পারলেও জনগণ কখনো ছেড়ে দে না । সেদিন বিয়ের আসরে বর বেধড়ক গণপিটুনি খেয়ে সে প্রায় আধমরা হয়ে গিয়েছিল। শুধু বিয়েবাড়ির আমন্ত্রিতরাই নন, দোষীকে শাস্তি দিতে আশেপাশের সবাই এসে জড়ো হয়েছিল এবং আইন প্রায় হাতে তুলে নিয়েছিল। সরকার তাকে ছেড়ে দিলেও জনগণ ছেড়ে দেয়নি।
সেদিন থেকে লোকটার একটাই পরিচয়- সে একটা ধর্ষক, একটা জানোয়ার। প্রাণে না মারলেও সমাজে তার এই পরিচয়ই তাকে তাড়া করে বেড়াত এবং কুড়ে কুড়ে মারত। মেয়ে লগ্নভ্রষ্টা হবে জেনেও এক কন্যাদায়গ্রস্থ পিতা সেদিন সকলের সামনে শয়তানের মুখোশ টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন।

এমন কিছু তো বাস্তবেও হতে পারতো, শুধু মেয়েরাই কেন?

Written by **শ্রেয়া লাহিড়ী**
Art **ঋজু নাগ**

Art by **ঋজু নাগ**

তিব্বতি দাঁত

আমি কৃষ্ণেন্দু রায়, একটা সেকেন্ডারি স্কুল এ পড়াই। কলকাতা সংলগ্ন জোকা তে থাকি। আমি অকৃতদার, সঙ্গে শুধু এক ভাইপো থাকে মলয়। সে তার নিজের এক ছোট স্টেশনারি দোকান নিয়ে থাকে, সেও বিয়ে করেনি, বলে এই বেশ ভালো আছি কাকা; এই ছোট ব্যবসা তে আরেক টা জীবনের দায়িত্ব নিতে পারবো না। আমার শখ বিভিন্ন বই পড়া, ঘুরতে যাওয়া নতুন নতুন জায়গা এই সব। স্কুল এ পড়ানো ভালোই লাগে, ছাত্রদের কৌতুহল, অনেক অনেক প্রশ্ন আমাকেও উজ্জীবিত রাখে। ইদানিং তিব্বতি লামাদের গল্প, তাদেরকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ঘটনা, তাদের জীবনযাত্রা এইসব বইয়ের মধ্যে ডুবে রয়েছি। বইগুলো পড়তে পড়তে বেশ ইচ্ছে করে একটু ঘুরে আসতে, সে তিব্বত না হয়ে নিদেনপক্ষে সিকিম হলেও চলবে।

স্কুলে গরমের ছুটি পড়াতে এক মাসের দীর্ঘ সময় পেয়ে গেলাম, ভাবলাম যাই তাহলে সিকিম ঘুরে আসি, আর সদ্য পড়া তিব্বতি লামাদের জীবনীর আকর্ষণ তো আছেই। বরাবরই আমি হোটেলের থেকে হোমস্টেই বেশি পছন্দ করি। তাই নির্দিষ্ট দিনে টিকেট কেটে পৌঁছে গেলাম এনজেপি, সেখান থেকে সড়কপথে প্রেমলাখা বলে ছোট্ট একটা গ্রাম এ পৌঁছলাম, শিলিগুড়ি থেকে প্রায় একশো তিরিশ কিমি দূরে, ভুটানের বর্ডারএ। আগে থেকেই একটা হোমস্টে বুক করে রেখেছিলাম। এক সিকিমি বৃদ্ধ দম্পতি, তাদের দুই মেয়ে বিয়ের পর বাইরে থাকে আর এঁরা নিজেদের ঘরের লাগোয়া একটা ছোট্ট ঘরে অতিথিদের রাখেন। হাতে অফুরন্ত সময়, তাই বেশ কিছুদিন আস্তানা গেড়ে বসলাম। কার্মাজী আর তার স্ত্রীর আতিথেয়তার কোনো তুলনা নেই। রোজ ই সকাল করে বেরিয়ে যেতাম, ছোট দুটো মনাস্ট্রি আছে যেখানে আমার বেশি সময় কাটতো। ওখানকার বেশ কয়েকজন লামাদের সঙ্গে পরিচিতি হয়ে গিয়েছিলো। এভাবেই একদিন প্রেমলাখার একটা ছোট্ট কিউরিওর দোকানে গিয়ে পড়লাম। অনেক ধরণের পুরোনো জিনিস দেখলাম, কিছু ঘর সাজানোর; কিছু ওখানকার লামাদের বিশ্বাসের জিনিস ইত্যাদি। এরই মধ্যে একটা পুরোনো দাঁত দেখতে পেলাম, সামনের পাটির দুটো দাঁত। বেশ পুরোনো মনে হলো দেখে, জিজ্ঞাসা করতে জানলাম এটি একজন পুরোনো লামা ধর্মগুরুর দাঁত আর তিব্বতি দের কাছে খুব ই জাগ্রত। দোকানদার বললেন এটি বিশ্বাস করে বাড়িতে রাখলে সমস্ত মনোবাঞ্ছা পূরণ হয়, অবশ্য আমার মনোবাঞ্ছা বলতে তো আমার একমাত্র ভাইপো মলয়ের উন্নতি। দোকানদার এও বললেন যে যদি আমি এই দাঁতের আশীর্বাদ পাই তাহলে শুধু আমার বা আমার পরিবারেরই ভালো হবেনা; কেউ যদি আমাদের অনিষ্ট করতে চায় তারও বিনাশ হবে।

বাড়িতে এসে নিজের বিছানার সঙ্গে লাগানো ছোট্ট টেবিলের ওপর দাঁতটা ভক্তিভরে রাখলাম, কার্মাজীর বৌ বললেন খুব ভালো করেছি, জীবনে অনেক আশীর্বাদ নিয়ে আসবে এই লামা ধর্মগুরুর দাঁত। এভাবে আরো কিছুদিন যাওয়ার পর আমার কলকাতা ফেরার দিন ঘনিয়ে এলো, নির্দিষ্ট দিনে কার্মাজী আর তার স্ত্রী কে বিদায় জানিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। একরাশ সুখস্মৃতি নিয়ে কলকাতা ফিরে নিজের স্কুলে আবার কাজে যোগ দিলাম। বাড়িতে মলয়কেও দাঁতের কথাটা জানালাম, ওরও দেখলাম বেশ কৌতুহল হলো।

এভাবে প্রায় বছর তিনেক কেটে গেলো আর এই তিন বছরে সত্যি বলতে কি আমাদের দুজনের পরিবারের অনেক কিছু পরিবর্তন এলো, এই যেমন আমার স্কুলের চাকরিতে পদোন্নতি হলো ; মাস তিনেক হলো আমি হেডমাস্টার হয়েছি। বেতন ও বেড়েছে আর সঙ্গে সম্মানটাও কম নয়। মলয় ও বলছিলো দোকানের স্টক কিছু বাড়াবে আর চটজলদি ব্যাঙ্ক থেকে কিছু লোন পেয়ে গিয়ে দোকানটা একটু বড় করলো। ইদানিং এই ঘটনা গুলোতে আমার ওই দাঁতটার ওপর খুব বিশ্বাস বেড়ে গেলো।

পরিমল আমার ছোট বেলার বন্ধু। প্রায় সমবয়সী, একটা প্রাইভেট কোম্পানি তে চাকরি করতো এখন ভলান্টিয়ারি রিটায়ারমেন্ট নিয়ে ছেলে বৌমার সাথে সুখের সংসার করছে, ওর একটা ছোট্ট সুন্দর নাতনী ও হয়েছে। পরিমলের ছেলে রাজীব আর ওর বৌ সুতপা মাঝে মাঝেই আমাদের বাড়িতে আসে। সব মিলিয়ে আমাদের দুই ফ্যামিলির মধ্যে খুব ভালো সম্পর্ক রয়েছে। একদিন পরিমলের পুরো ফ্যামিলির আমাদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ ছিল, আমার প্রোমোশনের জন্য একদিন ওদের খাওয়াবার ছিলই; তাই ঠিক করলাম এক রবিবারে ওদের বাড়িতে খেতে ডাকবো। আমার পরিবারের এই হঠাৎ কিছু ভালো ঘটনা ঘটে যাওয়া আমার বন্ধু পরিমলের চোখ এড়িয়ে যায় নি। খাওয়া শেষের পর বাইরে বেঠকখানায় সবাই মিলে আড্ডা দিচ্ছি আমি আর মলয় তো আছেই সঙ্গে পরিমল ওর স্ত্রী জয়া, রাজীব আর ওর স্ত্রী সুতপা। পরিমলের ছোট্ট নাতনি টা ঘরেতেই খেলে বেড়াচ্ছে। প্রশ্ন টা আসার ই ছিল, হঠাৎ পরিমল জিজ্ঞাসা করলো দাঁতের ব্যাপারে। আমি কিছু বলার আগেই মলয় বললো যে ও নাকি পরিমল কে দাঁতের ব্যাপারে কিছুদিন আগেই বলেছে, আমি পুরো ঘটনা টা সবাইকে বললাম আর লক্ষ করলাম রাজীব আর সুতপা খুব ই উৎসুক হয়ে পুরো ঘটনা টা। কোথায় আমি ঘুরতে গিয়েছিলাম, কোথায় থেকেছিলাম, তাদের যোগাযোগের কোনো নম্বর আছে কিনা ইত্যাদি। সঙ্গে কিউরিও দোকানের ডিটেলস টাও জেনে নিলো।

এরপর প্রায় চার মাস কেটে গেলো আর আমিও একদিন আবিষ্কার করলাম যে আমার বাড়িতে দাঁত আর নেই। তন্ন তন্ন করে সমস্ত বাড়ি খুঁজেও দাঁত পেলাম না। মলয় কে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, সেও কিছু বলতে পারলো না। মন টা সত্যি খারাপ হয়ে গেলো, নিজের ওপরই রাগ হচ্ছিলো যে একটা ভালো জিনিস যা আমাদের পরিবারে আশীর্বাদ হয়ে এসেছিলো তাও সামলে রাখতে পারলাম না। একটু ভয় ও যে হচ্ছিলো না তাও বলবো না। এরপর কিছু ঘটনা ঘটতে লাগলো যার জন্য আমি একেবারেই তৈরী ছিলাম না। আমার স্কুল এ একদিন একটি ছাত্র কে পড়াশোনায় অমনোযোগীর জন্য গায়ে হাত তুলেছিলাম, যা সত্যিই আমার অপরাধ ছিল কিন্তু সে যে এতো গুরুতর হবে ভাবিনি। ছেলেটি কে গালে চড় মেরেছিলাম মুখে মুখে তর্ক করার জন্য, সে মাটিতে হঠাৎ পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলো ; ডাক্তার কে ডাকা হলো সঙ্গে সঙ্গে। পরে জানা গেলো সে কিছু নার্ভের অসুখে ভুগছে আর তাই হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। এরপর স্কুলের কমিটি থেকে আমাকে ডাকা হলো, চূড়ান্ত ভর্ৎসনা করে এবং ছাত্রটির বাবা ও মায়ের নালিশ এর জন্য ছ মাসের জন্য সাসপেন্ড করা হলো। মলয়ের ব্যবসার বিক্রি মন্দা, পাশের বাড়ির সাথে নিত্য দিনের ঝামেলা সব ই শুরু হলো যা আগে কোনো দিন ছিল না।

আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম এর পিছনের কারণ কিন্তু দাঁত আর খুঁজে পাই নি। হঠাৎ একদিন খবর পেলাম রাজীব অফিস এ যাওয়ার সময় রাস্তায় একটা এক্সিডেন্ট এ নিজের ডান পা টা খুইয়েছে। এই ঘটনার জন্য সত্যি আমি একেবারেই তৈরী ছিলাম না। কতই বা বয়স, একটা পরিবার আছে, সামনে দীর্ঘ জীবন পড়ে আছে। পরিমলের বাড়িতে গেলাম সমবেদনা জানাতে, সুতপা খুব ই কান্না কাটি করছে। আমার সত্যি ভাষা নেই ওদের সমবেদনা জানবার, কিন্তু সুতপার মধ্যে একটা পরিবর্তন ও লক্ষ্য করলাম। ও আর আগের মতো যেন নেই, এড়িয়ে এড়িয়ে চলছে। আমার স্কুলের ঘটনা টাও পরিমল কে জানালাম কিন্তু ওর যা ক্ষতি হলো সে তুলনায় আমার মনে হয় কিছুই হয়নি । তাও যথাসাধ্য আমার তরফ থেকে পাশে দাঁড়াবার কথা বলে চলে এলাম।

এরপর প্রায় দুই সপ্তাহ কেটে গেছে, পরিমল কে দেখি রোজ বাজারে যায়। আর বেশি কথা বলেনা, মাঝে মাঝে একটা দুটো কথার উত্তর দেয়। নাতনি কে রোজ স্কুল এ নিয়ে যায়। রাজীবের স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে অনেক দেরি আছে বুঝতে পারি। ইতিমধ্যে, একদিন সুতপার সাথে রাস্তায় দেখা হলো আর রাজীবের কথা জিজ্ঞেস করতে বুঝলাম ও যে প্রাইভেট কোম্পানি তে কাজ করতো তারা এককালীন কিছু টাকা দিয়ে না করে দিয়েছে। সুতপা ভীষণ ভেঙে পড়েছে মানসিক ভাবে। আমাকে বললো আমার সাথে ওর কিছু কথা আছে, একদিন আসবে আমার বাড়িতে খুব শিগগিরই।

ঠিক এক সপ্তাহ পর সুতপা এলো উদ্ভ্রান্ত হয়ে ; আমি তখন রবিবারের এক সকালে বসে খবরের কাগজে শব্দ জব্দ করছি। আমি একটু অবাক ই হলাম, যদিও ও বলেছিলো আসবে তবে সেটা এতো তাড়াতাড়ি ভাবিনি। খানিক তা ইতস্তত হয়ে বললো যে ওই একদিন এই বাড়ি থেকে ওই দাঁতটা নিয়েছে। আমি বিস্ময়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম,ওকে কিছু টা সহজ করার জন্য প্রথমে বসতে বললাম, এক গ্লাস জল এগিয়ে দিলাম। ওর জীবনে আর পরিবারে যে দুর্ঘটনা নেমে এসেছে তার জন্য যে ওর লোভ ই দায়ী সেটাও জানালো ; কিন্তু অবাক আরো হলাম এটা জেনে যে ওর কাছে আর ওই দাঁত টা নেই, গত তিন দিন হলো ও ওই দাঁতটা খুঁজে পাচ্ছেনা। ও আমাকে দাঁতটা ফেরত দেবে ভেবেই সেদিন রাস্তায় বলেছিলো যে আমার সাথে ও দেখা করতে চায়। আমার আর কিছু বলার ছিল না, ওকে বললাম যে ভালোই হয়েছে ; হয়তো ওর ওপর থেকে এবার এই অভিশাপ টা কেটে যাবে ।

কাউকে কিছু না জানিয়ে সুতপা ওর এক ভাইকে নিয়ে হঠাৎ প্রেমলাখা তে গেছে, পরিমল এর কাছ থেকে প্রথমে এই খবর টা শুনে আমি চমকে গেলাম। সুতপা কিছু টা জোর করেই ওখানে গেছে। চার পাঁচ দিন পর পরিমল আর সুতপা এলো আমার কাছে, যা জানালো সেটা শুনে আমার পায়ের নিচ থেকে যেন মাটি সরে গেলো। ও ঠিকানা চিনে গিয়ে প্রেমলাখাতে ওই কিউরিওর দোকানে ঠিক ই পৌঁছেছিল, সেই দোকানে ও দাঁত টা দেখতে পায় ; একটা ছোট্ট বাটি তে রাখা ছিল। আমার ওই দাঁত কেনা ওনার থেকে শুরু করে পুরো ঘটনা যা আমার সাথে হয়েছে সব খুলে বলেছিলো ; কিন্তু ওই দোকানদার বলেছিলো যে সে নাকি কোনোদিন এই দাঁত কাউকে বিক্রি করেনি ।

Written by **সন্দীপ মুখার্জী**

মা

ভাদর শেষে আশিন এলো ক্যালেন্ডারের পাতায়
'মা আসছেন', 'মা আসছেন'
সবাই যখন উঠলো মেতে
আমি ভাবি, এই প্রবাসে
দুগ্গা মা কি সত্যি আসে
ঢাকের বাদ্যি বাজে না যে গলির মাথায় মাথায় ।।

পূজোর গন্ধ আসলে যে পাঁচমিশালি ধাঁধা,
নতুন জামা, শিউলিফুল আর
ধূপধুনো, ভোগ মিলেমিশে
একই তোড়ায় বাঁধা।
এখানে নেই সেই যে চেনা কিশোর-আশার
কান ফাটানো পূজোর গান।
গান ছাপিয়ে পূজোর মন্ত্র,
নাহয় হাসাহাসির ছন্দ,
সেই যে প্রবল শব্দদূষণ, সেই তো পূজোর কলতান।।

মনখারাপের কাজের মাঝে, দাঁড়াই গিয়ে জানালাপাশে
পড়লো চোখে নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা
মেঘের মাঝে ওই আকাশে
দেখি মায়ের মুখটি হাসে
তখন বুঝি মা আসলে আসেন মনের মাঝে।
শব্দগন্ধ কিছুতে নয়,
মা কে জানি ভালোবাসায়,
মা আমাদের ঘিরে আছেন সবখানে সবকাজে।।

মা বাঁধা নন তারিখ - মাসের ফাঁসে
তিনি আসেন পাড়ার পূজোয়, আসেন পরবাসে।
দেহমনের অসুর নিধন শেষে
মা যে আসেন আনন্দময়ী বেশে।
কখন দেখি দুর্গামায়ের মুখে
সবার মায়ের হাসি গেছে মিশে।।

Written by **চন্দ্রিমা মুখার্জী**

BSA Picnic 2024